মার্চ ১৯৮৬

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

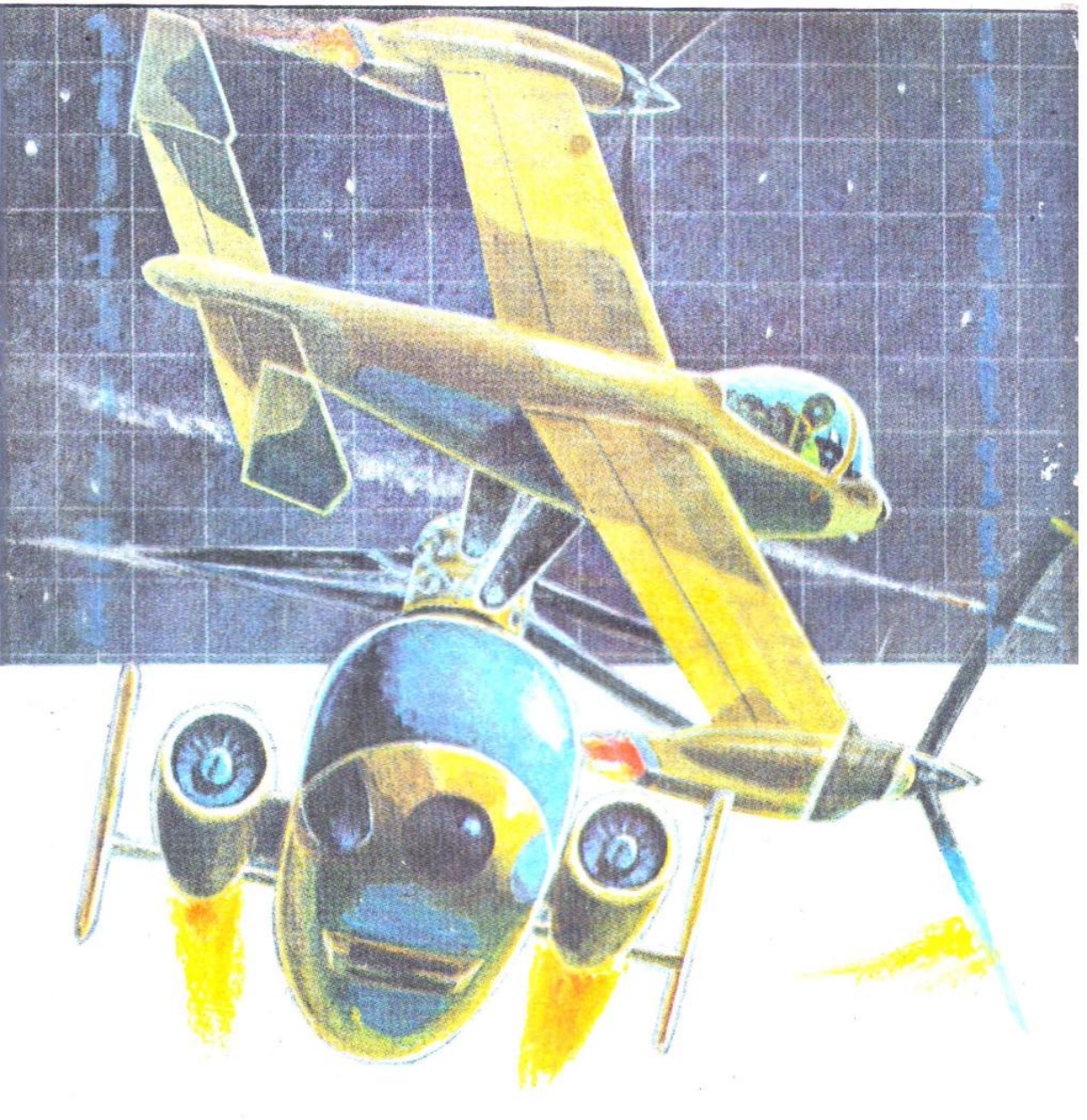

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

কিশোর রচনাবলী

জগদীশচন্দ্র বসু ॥ কিশোর রচনা সমগ্র ২৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
কিশোর রচনা সমগ্র ৩০.

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥
শার্লক হোমস্ কিশোর সমগ্র ২৫.

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ রোমাঞ্চকর ২৫

মেঘনাদ সাহা ॥ কিশোর রচনা সঙ্কলন ১২.

ভ্রমণ ও অভিযান

সুনির্মল বসু ॥ রোমাঞ্চের দেশে ৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
সুন্দরবনে সাত বৎসর ১০.

ধীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী ॥ দুরন্ত যাত্রী ৮.

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ গঙ্গা যমুনা ৮.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥
আমাজনের অরণ্যে ৮.

সুনির্মল রায় ॥ চাঁদের পাড়ি ৮.

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥ চক্রতীর্থের চমক ১০

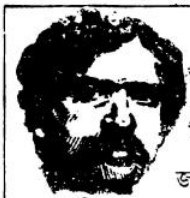

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গল্প প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও চিঠিপত্রের মূল্যবান সঙ্কলন

জগদীশচন্দ্র বসু

কিশোর রচনা সমগ্র ২৫

কিশোর ক্লাসিকস্

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ **তেপান্তর** ২০.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **কিশোর অপু** ২৫.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১০.

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়॥ **ছোটদের কাজল** ১০.

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা বিচিত্রা** ২৫.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ২৫.

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ॥ **বাঙলার ডাকাত** ২৮.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অপুর ছেলেবেলা ১০.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের অপরাজিত ১০

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **ভৌতিক গল্প** ১০.

আনন্দ বাগচি ॥ **মুখোশের মুখ** ৮.

কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রহস্য গল্প** ১০.

কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রোমাঞ্চ গল্প** ১০.

কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর গোয়েন্দা গল্প** ১০.

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **মোহনপুরের শ্মশান** ৬.

দেবব্রত চক্রবর্তী ॥**শেরিংহত্যা রহস্য** ১০.

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যক্ষপতির রত্নপুরী** ৬.

দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যখের আসন** ১০.

সম্প্রতি প্রকাশিত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর রহস্য গল্প

কিশোর রোমাঞ্চ গল্প

প্রতিটি দশ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

অমিতাভ চক্রবর্তী **ছোটদের বাঘের গল্প** ৮.

কেনেথ আন্ডারসন
শিবানীপল্লীর কালো চিতা ২০.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ **বনে জঙ্গলে** ১৫

অজয় হোম ॥ **বিচিত্র জীবজন্তু** ১২.

কেনেথ অন্ডারসন
মানুষখেকোর বিভীষিকা ১৫.

বইমেলায় প্রকাশিত হবে

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ **বাঙলার গাছপালা** ১৫.

প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ **মেজো কর্তার ভৌতিক গল্প** ১৫.

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ **শেকসপীয়ারের গল্প** ১০.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়॥ **ছোটদের মজার গল্প** ১০.

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ **সবার প্রিয় টেনিদা** ১০.

জ্ঞান ও আনন্দের আশ্চর্য সমীকরণ

কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পঞ্চম বর্ষ 11শ সংখ্যা March '86

আগামী সংখ্যায়

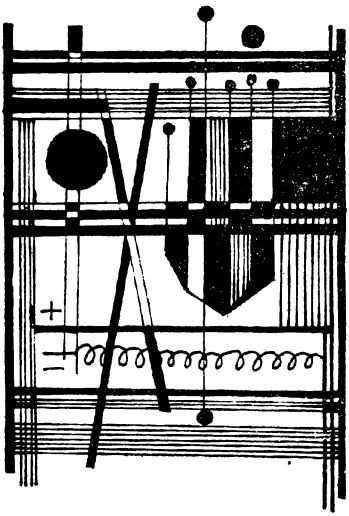

বর্তমান বিশ্বে 'ইলেকট্রন' এমনই একটি পরিচিত শব্দ যা মানব সমাজের সর্বত্রই কোন না কোন প্রসঙ্গে আলোচিত বা উচ্চারিত হয়ে থাকে। ইলেকট্রনের এরকম সর্বজন বিদিত হওয়ার কারণ কি? এর অন্যতম প্রধান কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যাবতীয় অবদানের মূল উপাদানই হল ইলেকট্রন।

'ইলেকট্রনিকস্-এর কলাকৌশল' এই শিরোনামে প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ অলক চক্রবর্তীর সর্বশেষ রচনা আগামী সংখ্যায় বিশেষ রচনা হিসেবে প্রকাশিত হবে।

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 : দপ্তর থেকে : আবিসেনা ॥ সমরজিৎ কর 7

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের কবলে ॥ মানস কুন্ডু 17 : কর্কট নীহারিকার বুকে ॥ অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় 20

বিশেষ রচনা

দূর আকাশের হাতছানি ॥ বিমল বসু 37

পড়াশোনা

পদার্থের কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 25 : এক মুহূর্তের যোগ ॥ কমল চক্রবর্তী 26 : বৃদ্ধি ও জনন ॥ দিনোজকুমার দে 27 : অঙ্কে নম্বর বাড়াতে হলে ॥ কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 28 : জৈব যৌগ সম্পর্কে কতটা জান? ॥ অমরনাথ রায় 37

ছবিতে গল্প

খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 21 : মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা (কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র) ॥ গৌতম কর্মকার 41

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

ভ্যান হেলমন্ট : টি. ভি. রাজন ॥ অমরনাথ রায় 40

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা

এক দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযান ॥ সুবীর দত্ত 14 : বুদ্ধি নিয়ে খেলা ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 16 : কম্পিউটার কি কি পারে ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 49 : নিকটতম নক্ষত্র পরিবার ॥ তীর্থঙ্কর ঘোষ 32 : জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই 51 : বিজ্ঞান সংবাদ 52 : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ 51

আবিষ্কারের গল্প

ডট পেন ॥ অপরাজিত বসু 38

রঙীন ফিচার

জানা-অজানার নানা খবর ॥ রেবতীভূষণ 11 : অরপিমেণ্ট ॥ অমরনাথ রায় 12 : নুললতা ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 53 : দরজা নেই এমন ঘর ॥ কিন্নর রায় 54

জীবজন্তু ও গাছপালা

কালমেঘ ॥ সন্দীপ সেন 39 : আন্দামানের দস্যুকাঁকড়া ॥ তপন আদক 6

ধারাবাহিক উপন্যাস

অমলধীয়ার রহস্য ॥ নিরঞ্জন সিংহ 29

ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ॥ বিমান বসু 9

প্রতিযোগিতামূলক রচনা

প্রচলিত কুসংস্কার ও তার প্রতিকার ॥ উদয়শঙ্কর সরকার 5 : হ্যালির বিদায় ॥ জাহাঙ্গীর আলম 59

ছোটদের দপ্তর

ক্যুইজ কনটেস্ট ও আই কিউ টেস্ট-এর উত্তরদাতাদের নাম 55 : লাইট মিউজিক ॥ কুন্তল অধিকারী 56 : আই কিউ টেস্ট 57 : ক্যুইজ কনটেস্ট 57 : শব্দকূট ॥ সুকৃৎ ঘোষ 57 : দোলনা ॥ রাজীব সাধু 58 : প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশ পাত্র 61 : বিচিত্র সংবাদ ॥ অসীম হালদার 62

ছবি এঁকেছেন : অলয় ঘোষাল

ধূমকেতু

শারদীয়া কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান সংখ্যা (1392) তে রমাতোষ সরকারে "বিচিত্র চরিত্র জ্যোতিষ্ক ধূমকেতু" তে লেখা আছে যে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ধূমকেতুর সবচেয়ে বড় পুচ্ছের দৈর্ঘ্য 32 কোটি কিলোমিটার কিন্তু কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান হ্যালীর ধূমকেতু বিশেষ সংখ্যার রমাতোষ সরকারের প্রবন্ধ "ধূমকেতু বার্তা : নেপথ্য কাহিনী"র প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে 1843 সালে যে ধূমকেতু দেখা যায় তার পুচ্ছের দেখা ছিল 80 কোটি কিলোমিটার। এই দুইটি পরিসংখ্যানের মধ্যে কোনটি ঠিক জানতে পারলে উপকৃত হব।

উদয় প্রতাপ প্রামানিক, ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।

হ্যালির ধূমকেতু সংখ্যা

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের আমি একজন প্রায় নিয়মিত পাঠক। ছোটদের কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যে আপনারা যে গুরু দায়িত্ব যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে চলেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলেছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান-মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমনই একটি ভূমিকা অপরিহার্য ছিল।

সম্প্রতি হাতে এল হ্যালির ধূমকেতু সংখ্যা। হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে কয়েক মাস ধরেই এখানে ওখানে বেশ কিছু লেখা পড়েছি, কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। সব প্রশ্নের উত্তর, সব ভাবনার সমাধান মেলেনি। তাই সংখ্যাটি হাতে পেয়ে না-পড়ে ফেলে রাখতে পারলাম না। হ্যালি পর্যবেক্ষণ, হ্যালির ধূমকেতু যুগে যুগে, খালি চোখে হ্যালির ধূমকেতু, ধূমকেতু-বার্তা : নেপথ্য কাহিনী—প্রতিটি লেখাই মূল্যবান। ধূমকেতু বিষয়ক, প্রশ্নোত্তরের সংযোজনে আপনাদের পরিকল্পনাটিকে সার্থক করেছে।

ছাত্র ও শিক্ষক—উভয়েরই জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার যে সুযোগ আপনারা করে দিয়েছেন, তা আমাদের প্রত্যাশা-টিকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে দিল।

—বরুণ মণ্ডল, শিক্ষক, শীলস্ ফ্রী কলেজ, 127, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-73

জল আমাদের জীবন

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান অক্টোবর-নভেম্বর 1985 সংখ্যায় "জল আমাদের জীবন" প্রবন্ধে আবদুল হক খন্দকার লিখেছেন :

'মায়ের পেটে যখন থাকি .... কিন্তু মূত্রে কি থাকে ?" ইত্যাদি।

ছোটদের কাজে বিস্তৃত লেখা সম্ভব নয়। তবুও জানাই আমরা ভ্রূণ অবস্থায় ঐ মূত্র খাই না। মা যা খায় তারই সার বস্তু মায়ের শরীরের 'প্লাসেণ্টার' ও 'আম্বেইলিকাল কর্ড' এর মধ্য দিয়ে ভ্রূণের শরীরে প্রবেশ করে ও খাদ্যরস জোগায়। ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

15 পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"বিপাক প্রক্রিয়ার দেহের কোন অংশ.....প্রতি-বিধান করে।' এ ব্যাপারটা বলতে চাইছেন শরীরের মধ্যে তাপের 'কণ্ডাক্সান' মত প্রক্রিয়া চলে।

মানুষের জ্ঞান যতদূর গেছে তাতে তারা বুঝেছে যে শারীরবৃত্তীয় তাপনিয়ন্ত্রণ হয় 'হাইপোথ্যালামাস্' এবং 'এড্রিনাল' গ্রন্থির সাহায্যে। বিশদভাবে লিখতে অনেক কষ্ট ও সময় করতে হবে। তাই বিরত হলাম।

শেষে একটি মন্তব্য করছি। ছোটদের সামনে ভুলতথ্য পরিবেশন করা ঠিক নয়। শ্রীবলরাম মজুমদার,
বসু বিজ্ঞান মন্দির কলকাতা-9

পড়াশোনা

আমি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এর একজন নিয়মিত পাঠক। বিবেক রায়ের 'বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতু সম্বন্ধে কতোটা জান' আলোচনায় ২নং প্রশ্নে (রাসায়নিক দ্রব্য বিভাগ) এর উত্তর আমার মনে হয় ভুল। কারণ ওয়াটার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড (রাসায়নিক সংকেত CO) এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের (রাসায়নিক সংকেত H_2) মিশ্রণ।

ঐ বিভাগের 13নং প্রশ্নে ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক সংকেত Ca (occ) cl কিন্তু Ca (occ) নহে। আমার মনে হয় ওটা ছাপার ভুল।

যদি সঠিক উত্তরগুলো জানান তবে বাধিত থাকিব।

দীপক বাগ
খালোড়, বাগনান, হাওড়া।

রঙীন ফিচার

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার বিবিধ অতি আকর্ষণীয় রচনাগুলির মধ্যে প্রতি সংখ্যায় কিন্নর রায় রচিত আমাদের অজানা কিছু আশ্চর্য বস্তু-বিষয়ক রচনাগুলি অন্যতম প্রধান। রায় মহাশয়ের লেখনী যেমন চমক-প্রদ, তাঁর তথ্যগুলিও তেমনি মনোগ্রাহী। উপরন্তু রচনার সঙ্গে ঐ সব বিষয়ের রঙিন ছবিগুলি রচনাকে আরও জীবন্ত করে তোলে। কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন জাগছে যে, কোথা থেকে এবং কিভাবে 'রায়' মহাশয় ঐ তথ্যগুলি এবং বিশেষ করে ছবিগুলি সংগ্রহ করেন। এ বিষয়ে কিছু জানালে আমার কৌতূহলী কিশোর-মন খুব খুশী হবে।

মনীশ কুমার ঘোষ,
313, মহারাজা নন্দ কুমার রোড (দঃ)
বরাহনগর, কলিকাতা-700 036.

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

প্রচলিত কুসংস্কার ও তার প্রতিকার

উদয় শঙ্কর সরকার

কুসংস্কার বলতে বোঝায়, ভীতি-দূরীকরণে, কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপূরক হিসেবে কতগুলো ভ্রান্ত মনোভাবপূর্ণ শব্দ সমষ্টি তথা বাক্য সমষ্টি। এক বিংশ শতাব্দীর দোড় গোড়ায় এসে ভারতবর্ষের মত উন্নতি-শীল, সভ্যতার অগ্রগামী দেশেরও অন্যতম প্রধান সমস্যা 'প্রচলিত কুসংস্কার'। শিক্ষার-জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে পড়ার পরে আজও শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভারতীয়ের মনগভীরে প্রোথিত রয়েছে কুসংস্কারের সুদৃঢ় শিকড়।

কুসংস্কারের জন্ম উৎস সন্ধানে সুদূর প্রাচীনকালে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আদিম মানব সমাজের 'Magic Belife' বা, 'যাদুমূলক বিশ্বাস' থেকে এর সূত্রপাত। আদিম মানবের জীবন ছিল শিকার নির্ভর। উদরপূর্তি ও আত্মরক্ষার তাগিদে তারা পশু হত্যা করত। জীবনও ছিল সঙ্কটময়। তখন সামান্য উপকরণ নিয়ে মানুষকে লড়াই করে বাঁচতে হতো। কিন্তু বিপুল বাধার সামনে দাঁড়িয়ে তারা স্বভাবতই হয়ে পড়ত অদৃষ্ট নির্ভর। তারা শিকারে যাওয়ার পূর্বে গুহাগাত্রে শিকারের, পশু হত্যার চিত্র অঙ্কণ করত শিকারে সাফল্য ও জয় প্রাপ্তির জন্য। এবং বলা যায়, বর্তমান 'কুসংস্কারে'র আদিমতম রূপটি প্রাচীনের যাদুমূলক বিশ্বাস থেকে ক্রমধারার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে।

'কুসংস্কার'—শব্দটুকুর মধ্যেই একটি ব্যাকরণগত ত্রুটি রয়ে যায়। কারণ, 'কু'-শব্দটি পরের সংযোজন। প্রথম শব্দ 'সংস্কার', তাই আমাদের প্রথম অভিযান হওয়া উচিত 'সংস্কারে'র বিরুদ্ধে, তারপরে 'কুসংস্কার'। আধুনিক সভ্য জগতে শিক্ষিত-সুস্থ-মানুষ পরিচালিত হবে তার অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান, নিজস্ব বিচার ক্ষমতা এবং যুক্তির সাহায্যে। এক্ষেত্রে 'কুসংস্কার'—কথাটি নিরর্থক।

রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন বরাহ, মিহির এবং খনা। তৎকালীন সময় থেকেই মানুষ 'দৈব' নির্ভর হয়ে নিজ প্রয়োজনার্থে বিশ্বাস করে এসেছে জ্যোতিষশাস্ত্র, খনার বচন প্রভৃতিকে। আধুনিক কালেও এই বচন প্রচলিত। মনে করা হয়, খনা জিভ কেটে ফেললে টিকটিকি তা ভক্ষণ করে। তাই বলা হয় কোন কথার পরিপ্রেক্ষিতে টিকটিকি ডাকলে তা সত্যি হবে। তাছাড়া, কোন শুভ কার্যারম্ভের সময় কেউ 'হাঁচলে' লোকে বিরক্ত হয়।

এই ছোট-খাটো জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই এমন কিছু কুসংস্কার মানব মনে ছিল, যেগুলো সমাজের উপর একটা বিরাট ছায়া ফেলেছিল। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তখন মানুষের বিশ্বাস ছিল ব্যাখ্যাহীন—অমূলক বিষয়বস্তু। শুধুমাত্র 'কুসংস্কার'ই এইগুলির জন্য দায়ী নয়। 'কুসংস্কারে'র পাশাপাশি জেগে উঠেছিল তৎকালীন পুরুষ-শাসিত সমাজের স্বার্থপরতা, নীচতা ও মানবিক ঔদ্ধত্য।

এই একচেটিয়া সমাজে 'কুসংস্কার' মোচনের চেষ্টা এবং সার্থক প্রণয়ন করেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামীবিবেকানন্দ প্রভৃতি মানবতাবাদীগণ।

বর্তমান সমাজেও অনেক 'কুসংস্কার' প্রচলিত আছে এবং তার মধ্যে সর্ব প্রধান হল পণ প্রথা। যদিও এর বিরুদ্ধে সরকারি ঘোষণা হয়েছে তবে তা কার্যকরী হয়নি।

শুধুমাত্র সমাজের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিষয়ে কুসংস্কারের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যেমন—আগে গ্রহণের ব্যাখ্যা হিসাবে প্রচলিত ছিল 'রাহুর গলা-কাটা' যাওয়ার গল্পটি। ভূমিকম্প হলে শঙ্খ এখনও বাজান হয় ইত্যাদি। এ পর্যন্ত বিজ্ঞানে বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন—গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, জগদীশচন্দ্র বসু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বৈজ্ঞানিকেরা। এমনকি বর্তমান বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কুসংস্কার মেনে না নিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করে চলেছেন।

এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, 'কুসংস্কার' মানুষের একটা ভীতিমূলক দুর্বল স্থান থেকে জন্ম লাভ করেছে এবং এই ভীতিরই প্রতিকারার্থে প্রযুক্ত হয়ে চলেছে। জলের আকারের (জল যেই পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে) সঙ্গে তুলনা করে বলা চলে, 'সংস্কারকে যে ভাবে মনের মধ্যে ধরে রাখা হবে সংস্কারও তেমন ভাবেই মানব মনে দৃঢ়তা লাভ করবে। অর্থাৎ, কুসংস্কার আপেক্ষিক, আধুনিক বিজ্ঞানের ও যুক্তি-বাদের যুগে আমরা সবকিছুকে তর্ক ও যুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করে সংস্কার বর্জন করব এবং এটাই হবে আমাদের 'কুসংস্কার-সংস্কার' বর্জনের মূল ব্রত।

88B রেলকোয়ার্টার, কল্যানী নদীয়া।

আন্দামানের দস্যু কাঁকড়া

তপন আদক

আন্দামানের এ্যাবার্ডিন বাজারের পূর্ব দিকে সমুদ্রের ধারে একটা ছোট্ট পার্ক আছে, তার নাম মেরিনা পার্ক। তের বছর আগে একদিন আমি মেরিনা পার্কে বেড়াচ্ছি। রাস্তায় দেখি কতকগুলো মরা শামুকের শেল গুড়ি গুড়ি করে হেঁটে চলেছে, ভাল করে দেখি এদের পা আছে, গোঁফ দাড়িও আছে। আমাদের হুগলীতে এ ধরণের পা ওয়ালা মরা শামুকের খোলকে হাঁটতে দেখিনি। আশ্চর্য হলাম কাণ্ড কারখানা দেখে। পরে জানলাম এরা শামুক নয়, এদের নাম সন্ন্যাসী কাঁকড়া। এ ধরনের স্থলচারী কাঁকড়ারা শেল নিয়ে জন্মায় না, শেলকে আশ্রয় করে থাকে মাত্র। আন্দামনের সমুদ্রের ধারে এমনকি পথে ঘাটে এ ধরনের সন্ন্যাসী বাবাদের প্রচুর দেখা যায়। এ ছাড়া আন্দামানে এক আশ্চর্য ধরনের কাঁকড়া আছে যাদের কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হতে হয়। এদের নাম দস্যু কাঁকড়া (Robber crab) জীববিদ্যায় এদের নাম Birgus Latro, এদের আবার Coconut Crabও বলে। প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপে আর আন্দামানে, বিশেষ করে সাউথ সেণ্টিন্যাল দ্বীপে এদের দেখা যায়। এক একটি দস্যু কাঁকড়ার ওজন হয় প্রায় তিন থেকে চার কেজি ; সাইজ হয় ছয় ইঞ্চি কিংবা তার থেকেও বড়। একটা কাঁকড়া শিকার করতে পারলে স্বচ্ছন্দে একটা পরিবারের একদিন মাংস ভাত খাওয়া যেতে পারে। এদের গায়ে লাল নীল রঙের বাহার ; দশটি পা, পায়ের ডগায় তীক্ষ্ন নখ। নামেই তো দস্যু কাঁকড়া, কাজেই লড়াই করতে খুব ওস্তাদ এরা। লড়াই এর সময় তীক্ষ্ন নখ দিয়ে সহজেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারে। পিছনের পা জোড়া সাইজে ছোট এবং ভিতরের দিকে গোটানো। এ পা দিয়ে এদের চর্বিওলা পেটকে রক্ষা করে। এদের তলপেটে থাকে চর্বিভরা। বুক থেকে পেট পর্যন্ত হয় সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাঁজে ভরা। সামনের চারটি পায়ের সাহায্যে তর তর করে নারকেল গাছে উঠতে পারে। নারকেল গাছে উঠে নারকেলের কাঁদিকে শক্ত দাড়া দিয়ে কেটে ভূপাতিত করে। গাছ থেকে নারকেল পাড়া হয়ে গেলে, দস্যুকুলের নারকেল ভোজ চলতে থাকে। নারকেলের মাথার দিকটা তুলনামূলকভাবে নরম। তাই মাথার দিক থেকে এরা নারকেল ফাটিয়ে নারকেলের নরম শাঁস ভক্ষণ করে। নারকেল এদের প্রিয় বলে এদের Coconut crab বলে। নারকেলের ভক্ত বলে এরা কিন্তু বৈষ্ণব নয়, আমিষ আহারেও এদের সমান রুচি। পরম তৃপ্তির সঙ্গে পোকামাকড় ছোট ছোট জীব হাতের কাছে যা পায় তাই খেয়ে নেয়। এরা স্থলচারী জীব, স্থলই এদের বিচরণভূমি। গর্ত হলো এদের পারিবারিক বাসস্থান। স্ত্রী কাঁকড়া আবার লজ্জাবতী, গর্তের ভিতর থেকে বের হতে এদের লজ্জা। তলপেটে যখন স্ত্রী কাঁকড়ার ডিম ফুটে শুককীট বের হয় তখন শুককীটগুলোকে মুক্তিদান করে। শুককীটগুলো সমুদ্রের জল দ্বারা দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। শুককীট যখন ছোট কাঁকড়ায় পরিণত হয় তখন এরা গুটি গুটি পা পা করে ডাঙায় উঠে আসে।

মানুষকে দস্যু কাঁকড়াদের খুব ভয়। যে সমস্ত দ্বীপে মানুষজন নেই সে সব দ্বীপ এদের খুব পছন্দ। ঘোরা-ফেরায় সাবধানতার অন্ত নেই। রাতের অন্ধকারেই এরা বের হয় বেশি। আন্দামানের সাউথ সেণ্টিন্যাল জনবিরল, আশপাশের দ্বীপগুলোতেও মানুষজন নেই। কাজেই এ দ্বীপ দস্যু কাঁকড়াদের স্বর্গরাজ্য।

পোর্টব্লেয়ার আন্দামান।

।। আবিসেনা ।। সমরজিৎ কর

ওষুধ নিয়ে বিজ্ঞানীরা তো কত গবেষণাই না করছেন। তৈরি হচ্ছে কত রকমই না ওষুধ। কিন্তু আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্যে যে মানুষটি অমর হয়ে রয়েছেন সত্যিই তাঁর তুলনা নেই। আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানীরাও তাঁরা নামে এখনো মাথা নত করেন।

আসল নাম আলি আল্-হুসেন ইবন্ আবদাল্লা হাসান আলি সিলা। বেজায় বড় নাম। মনে রাখা শক্ত। তাই হিব্রু ভাষায় নামটি খাটো করে রাখা হল আবিএসিনা। আরবি ভাষায় ইবন্-মিলা। পরে লাতিন ভাষায় আরও খাটো করে করা হল আবিসেনা। বহু মনীষীর জন্মস্থান ইরান। আল্-ফারারি, আল্-বিরুনি, আল্-তাবারি, আল্বিয়াজ, আল্-রুমি, ওমর খৈয়াম, ফিরদৌসি, সাদি, হাফিজ এবং আরো অনেকের। আবিসেনা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং মানব কল্যাণে তাঁর অবদান এক সময় ছড়িয়ে পড়েছিল পারস্য, আরব পেরিয়ে ভারত এবং গোটা ইউরোপে।

দপ্তর থেকে

বিচিত্র জীবন। জন্ম অগাস্ট, 980 খ্রীস্টাব্দে। বুখারা জেলার আফসেনা শহরে। জায়গাটি এখন উজবেক সোভিয়েত এর মধ্যে পড়ে; বাবা আবদাল্লা। তিনি ছিলেন বাল্খ এর অধিবাসী। চাকরির তাগিদে দেশ ছেড়ে তাঁকে বুখারায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়। মায়ের নাম সিতারা। তিনি ছিলেন পারস্যের মেয়ে। বুখারায় এসে আবদাল্লা প্রথমে টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যবসায় শুরু করেন। বিদেশী টাকা নিয়ে দিতেন স্বদেশী টাকা। এখন যেমন টাকা নিয়ে ডলার, মার্ক, প্রভৃতি কেনা বেচা হয়, ডলার, মার্ক, পাউণ্ড দিয়ে টাকা—সেই রকম। পরে পারস্যের সুলতান নুহ্ ইবন্ মনসুর-2 তাঁকে খারমাথিয়ান জেলার প্রধান শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

শৈশব থেকেই আবিসেনা ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। মাত্র দশ বছর বয়েসে তিনি পবিত্র কুরআন আয়ত্ত করেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, ভারতীয় গণিত, বিশেষ করে বীজগণিত। ওই সময় বিখ্যাত পণ্ডিত আবদাল্লা ইব্রাহিম ইবন্ হুসেন এসেছিলেন বুখারায়। বালক আবিসেনা তাঁর কাছে পাঠ নেন ধর্মতত্ত্ব, ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে। অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করেন পিথাগোরাসের গণিতশাস্ত্র এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের একাধিক গ্রন্থ। কণ্ঠস্থ করেন অ্যারিস্টটলের 'মেটাফিজিকা'।

কিন্তু যে কারণে আবিসেনা এখনো অমর সেটা চিকিৎসাবিজ্ঞান। এ ব্যাপারে তাঁর গুরু ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক আবু সাহল ইসা ইবন্ ইহাইহা আল্ মাসিহি এবং আবু মনসুর হাসান ইবন্ মুহাম্মদ আল্-খুমারি। শোনা যায় বালক বয়েসেই রোগ পরীক্ষা এবং রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে আবুসিনার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। প্রতিদিন বহু রোগী তাঁর কাছে ভিড় করত। তাদের চিকিৎসার জন্যে তিনি অর্থ নিতেন না।

একবার বুখারার সুলতান কঠিন এক রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। হুলস্থুল ব্যাপার। কি যে রোগ এমন কি সুলতানের চিকিৎসকও তা ধরতে পারলেন না। ডাক পড়ল আবিসেনার। তখন তাঁর বয়েস ষোল কি সতের। সুলতানের রোগ নির্ণয় করলেন তিনি, এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁকে সুস্থও করে তুললেন। সুলতান খুব খুশী। তাঁকে বললেন, "তোমাকে আমি পুরস্কার দিতে চাই। বল, কী তোমার আকাঙ্ক্ষা।" আবিসেনা বললেন, "আর্থিক পুরস্কার চাই না। সুলতান আমাকে শুধু এই অনুমতি দিন, আপনার সুন্দর পাঠাগারটিতে বসে আমি যেন নিয়মিত পড়াশুনা করতে পারি।" খুশী হলেন সুলতান। তাঁর আবেদনে সম্মত হলেন। পাঠাগারের দুর্লভ পুঁথিপত্র তাঁকে মুগ্ধ করল। অল্প দিনেই সমস্ত পুঁথিপত্র তিনি মুখস্ত করে ফেললেন।

কিন্তু একেই বলে দুর্ভাগ্য। কিছু দিন পর হঠাৎ এক অগ্নিকাণ্ডে পাঠাগারটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অমনি শত্রুরা রটিয়ে দিল, এটা আবিসেনারই কাজ। পাঠাগারে সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার নিজের মগজে পুরে নিজেই তিনি পাঠাগারটি পুড়িয়ে দিয়েছেন। যাতে সেই সঞ্চিত জ্ঞান আর কেউ না লাভ করতে

পারে। ফলে সুলতানের রোষে পড়লেন আবিসেনা। বুখারা থেকে তাঁকে বিতাড়িত করা হলো। এর পর নানা জায়গায় তাঁকে বাস করতে হয়েছে। কখনো হামদান-এ; কখনো খাওয়ারিজম-এ; শেষে ইস্পাহানের রাইয়ায় এসে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ রচনার কাজ। একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ—নাম 'মাজমু', অপরটি আইন এবং নীতি বিষয়ক গ্রন্থ—'আল্-হাসিল ওয়া আল্-মাশুল'। এই সময় তিনি শেখ আবু আল্-রোহান মুহাম্মদ ইবন্ আহ্মদ আল-বিরুণির সহযোগী হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অনুশীলন করেন।

দপ্তর থেকে

মোট 276টি বই লিখেছেন আবিসেনা। বিষয় দর্শন, গণিত, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, ধ্বনিবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কবিতা, প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে দুটি গ্রন্থ খুবই বিখ্যাত। একটির নাম আল্-শিফা আল্-কানুন ফি আল্-টিবব্। এতে তিনি তর্ক-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম কিতাব আল-ইশারত ওয়া আল তাঁবিয়ত। এতে আলোচনা করেছেন খনিজবিজ্ঞান, প্রস্তর বিদ্যা, রসায়ন এবং ঔষধ বিজ্ঞান। এই বইটি বারো খ্রীস্টাব্দে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং সারা ইউরোপে সমাদর পায়।

তবে যে অবদানের জন্যে এখনো তিনি পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে অমর, সেটি তাঁর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থ 'আল কানুন ফি খাল-টিব্ব্'। তাঁর সময়ে বিভিন্ন দেশে যে সব চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল সে সব তিনি অনুশীলন করেন, পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচার করেন। সেই অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তিনি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে সারা ইউরোপে এই গ্রন্থটির উপর নির্ভর করে অষ্টদশ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসা চালান হয়।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের স্থলপথে সংযোগ। সেই পথেই পড়ে বুখারা। যাতায়াতের সময় বুখারায় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বহু গুণী মানুষ আসতেন গ্রীক, রোমক এবং ভারতীয় পণ্ডিত। তাঁদের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে আবিসেনা আলোচনা করতেন। "আল কানুন"-সেই সব আলেচনার কথাও লেখা হয়েছে।

'আল কানুন'-এর লেখা শুরু হয় গুরগঞ্জে। শেষ হয় রাইয়ায়। বইটির পাঁচটি খণ্ড। বিষয়-বস্তুর মধ্যে রয়েছে ঔষধ বিজ্ঞান, চিকিৎসা পদ্ধতি, বিভিন্ন রোগের বিবরণ, ওষুধের গুণাগুণ, প্রভৃতি। মাটি এবং জল থেকে কী কী রোগ হতে পারে, কি ভাবে তাদের সারান যায় সে কথাও তিনি লিখেছেন। শল্য চিকিৎসার কথাও।

মধ্যযুগে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল কানুন' চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের অন্যতম প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলির মধ্যে ছিল মনতোপেলিয়ের, বলগনো, লুভেইন, লাইপজিগ, টুবিংসেন এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়। 1520 থেকে 1588 পর্যন্ত ভিয়েনা এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আল্ কানুন'-এর বছর ছিল সবচেয়ে, বেশি। পশ্চিমী চিকিৎসরা বলেছেন, 'আল-কানুন' তাঁদের কাছে বাইবেলের মত। প্রসিদ্ধ চিকিৎসা বিজ্ঞানী ফেরারি তাঁর ক্রাস গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটস-এর নাম উল্লেখ করেছেন 140 বার, গ্যালেন এবং আল্-রাজির নাম 300 বার। আর আবিসেনার নাম করেছেন 3000 বার। এ থেকেই বোঝা যায় চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন। ভারতে হেকিমী চিকিৎসদের কাছে তাঁর এই গ্রন্থটি এখনো অতুলনীয়। ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ব্যাপারেও অনেক কথা লিখেছেন তিনি। চরকের উপর ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'আল্-শরক-উল্-হিন্দ' এ চরকের চিকিৎসা পদ্ধতি বিবরণ দিয়েছেন। 'টিব-ই-উনানি' গ্রন্থে লিখেছেন প্রায় ষাট রকম আয়ুর্বেদিক গাছ গাছড়ার কথা। জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপারে তিনি জাতিধর্ম মানতেন না।

1037 খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

ভারতীয় জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

বিমান বসু

বলতে পারো, এশিয়ার বৃহত্তম দূরবীনটি কোথায় আছে ? তোমাদের অনেকেই হয়ত এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। শুনে হয়ত অবাক হবে, সেটা রয়েছে এই ভারতেই, ব্যাঙ্গালোরের কাছে ভারতীয় জ্যোতিঃ পদার্থ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (Indian Institute of Astrophysics) বা সংক্ষেপে 'আই আই এ'র কাভালুর মানমন্দিরে। সম্পূর্ণভাবে দেশে তৈরি এখানকার সবচেয়ে বড় দূরবীনের প্রধান আয়নার ব্যাস 234 সেণ্টিমিটার (প্রায় 93 ইঞ্চি । সুদূর নক্ষত্রজগতের চিত্রগ্রহণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে গবেষণার জন্য এর সঙ্গে রয়েছে আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যাতে করে ক্ষীণতম নক্ষত্রের ছবিও অনায়াসে তোলা যায়। তাছাড়া নক্ষত্র আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ ও অন্যান্য পরীক্ষার সুবিধাও এখানে রয়েছে। এক কথায় বলা যায় 'আই আই এ'র ক্যাভালুর মানমন্দির আজ বিশ্বের যে কোনও আধুনিকতম মানমন্দিরের সমতুল্য। ফলে এখন আর জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য ভারতীয় তরুণদের বিদেশী মানমন্দিরগুলির ওপর নির্ভর করতে হবে না। গত 6 জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে কাভালুরে 234 সে মি দূরবীনটি চালু করেন। আই-আই এ'র প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাঃ ভেইনু বাপ্পুর সম্মানে দূরবীনটির নাম রাখা হয়েছে 'ভেইনু বাপ্পু দূরবীন'।

কাভালুরের 234 সেণ্টিমিটার দূরবীনটি সবেমাত্র চালু করা হলেও ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তোমরা নিশ্চয়ই আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ভাস্করাচার্যের নাম শুনেছ। এঁরা সকলেই জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং বিশ্বব্যাপি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আর্যভটীয়, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ইত্যাদি গ্রন্থে এঁদের গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাছাড়া 18 শতাব্দীর গোড়াতে রাজা জয়সিংহ যে সব বিশাল বিশাল ইঁট পাথরের মানমন্দির বা 'যন্তর মন্তর' নির্মাণ করিয়েছিলেন সেগুলোও প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার উজ্জল নিদর্শন। কিন্তু সে সময় পাশ্চাত্যে ও ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য ছিল। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে দূরবীন আবিষ্কার হয়েছিল 1609 সালে। পরবর্তীকালে দূরবীনই ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রধান সহায় ছিল। কিন্তু ভারতে তা হয়নি। শোনা যায় রাজা জয়সিংহের কাছেও একটি দূরবীন ছিল। কিন্তু তিনি কখনও সেটা জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কাজে ব্যবহার করেননি।

ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় দূরবীনের ব্যবহার শুরু হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। 1786 সালে উইলিয়ম পিত্রি (William Petrie) নামে এক ইংরেজ ধর্মযাজক সর্বপ্রথম মাদ্রাজ থেকে একটি তিন-ইঞ্চি প্রতিসারক দূরবীন দিয়ে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এর পর 1792 সালে মাদ্রাজেই প্রথম মানমন্দির স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে মাদ্রাজ শহরের বিস্তারের ফলে সেখান থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে 1897 সালে মাদ্রাজের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোদাইকানালে নতুন মানমন্দির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মানমন্দিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বাটন করা হয় 1901 সালে। সে সময় সেখানে দুটি মাত্র ছোট দূরবীন ছিল।

স্থাপনার পর দীর্ঘ 70 বছর ধরে কোদাইকানাল মানমন্দির থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। 1909 সালে এখান থেকেই সৌরকলঙ্কের অধ্যয়ন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন্ এভারশেড্ বিখ্যাত 'এভারশেড্ এফেক্ট' বা সৌরকলঙ্কের মধ্যে ক্রমাগত পদার্থের প্রবাহ আবিষ্কার করেন। 1910 সালে হ্যালি'র ধূমকেতুর আবির্ভাবের সময়ও এখান থেকে ধূমকেতুটির বহু ছবি তুলে তার গঠন নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। 1960 সালে সূর্যের সম্পর্কে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে এখানে একটি সোলার টাওয়ার স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্র স্থাপন করা হয়।

মাদ্রাজের তুলনায় অনেক দিক দিয়ে ভাল হলেও কোদাইকানালের এক বড় অসুবিধা হল এখানকার মেঘ। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় এখানের আকাশের হাল্কা মেঘ দেখা যায় যা কেটে যেতে বেশ সময় লাগে। ফলে এখানকার দূরবীনে - মাঝ রাত্তিরের আগে প্রায় কোনও কাজই শুরু করা যায় না। এ সব অসুবিধা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। 1945 সালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অধ্যক্ষতায় যুদ্ধোত্তর ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে এক সমিতি গঠিত হয়। ঐ সমিতি যে সব প্রস্তাব দেন তার মধ্যে একটি ছিল দেশে একটি বিশাল কেন্দ্রীয় মানমন্দির নির্মাণের জন্য কোদাইকানালের বিকল্প

হিসেবে কোনও স্থান বেছে নেওয়া। কিন্তু 1947 সালে স্বাধীনতালাভের পরও নানা কারণে এ প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। তা হয় আরও প্রায় দু'দশক পরে।

1960 সালে কোদাইকানাল মানমন্দিরের ডিরেক্টর হয়ে আসেন এক তরুণ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এম কে ভেইনু বাপ্পু। তাঁর স্বপ্ন ছিল দেশে একটি আধুনিক মানমন্দির স্থাপন করা যেখানে ভারতীয় তরুণেরা অবাধে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সুযোগ পাবে। কাভালুর মানমন্দির তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টার ফল।

প্রথমে যখন কোদাইকানালের বিকল্প হিসেবে জায়গা বেছে নেওয়ার কথা ওঠে তখন অনেকেই মধ্যভারতে উজ্জয়িনীর কথা ভেবেছিলেন। তোমরা নিশ্চয় জানো যে প্রাচীন ভারতে উজ্জয়িনী জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে উজ্জয়িনী শহর অনেক বিস্তার লাভ করেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে আর সেই সঙ্গে পরিবেশ ও বায়ু দূষণের মাত্রাও বেড়েছে। ফলে সেখানে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য মানমন্দির স্থাপনের কোনও মানে হয় না।

এই সব নানা চিন্তা করার পর ভেইনু বাপ্পু স্থির করলেন যে নতুন মানমন্দিরটি দক্ষিণ ভারতেই হওয়া উচিত। এর পেছনে অবশ্য আরও একটা বড় কারণ ছিল। তা এই যে, দক্ষিণ আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য শক্তিশালী দূরবীন খুব কম দেশের কাছেই আছে। বিশ্বের বেশিরভাগ

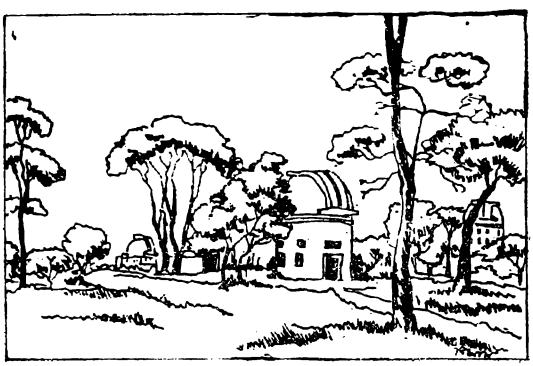

জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার, ব্যাঙ্গালোর

আধুনিক মানমন্দির রয়েছে সুদূর উত্তরে আমেরিকা ও ইউরোপে যেখান থেকে দক্ষিণ আকাশের খুব অল্পই দেখা যায়। বিষুবরেখার কাছাকাছি মানমন্দির থাকলে সে অসুবিধে নেই কারণ সেখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আকাশের প্রায় সবটাই দেখা যায়।

প্রায় দু'বছর খোঁজাখুঁজির পর বাপ্পু মাদ্রাজ ও ব্যাঙ্গালোরের মাঝামাঝি জাভাডি পাহাড়ে সমুদ্রতল থেকে প্রায় 800 মিটার ওপরে কাভালুর গ্রামের কাছে এক এলাকা বেছে নিলেন। চন্দন বনে ঘেরা এই স্থানটিতে মানমন্দির স্থাপনের জন্য সব প্রয়োজনীয় উপাদানই বিদ্যমান। এখানকার আকাশ প্রায় সারা বছরই মেঘশূন্য থাকে। তাছাড়া লোকালয় থেকে বহু দূরে হওয়ার দরুণ এখানকার আকাশে ধোঁয়া, ধুলো ও বিজলী বাতির তেজ নেই।

কাভালুরে প্রথম 15 ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনটি লাগানো হয় 1967 সালে। তারপর 1968 সাল থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। 1972 সালের মে মাসে আরও শক্তিশালী এক মিটার (40 ইঞ্চি) ব্যাসের প্রতিফলক দূরবীন লাগানো হয়। অবশেষে 1985 সালের নভেম্বরে কাভালুরে আসে 234 সেমি. (93 ইঞ্চি) ব্যাসের প্রতিফলক দূরবীনটি।

ইতিমধ্যে দেশে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা চালানোর উদ্দেশ্যে 1971 সালের পয়লা এপ্রিল তারিখে ভারতীয় জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান বা 'আই আই এ'র আনুষ্ঠানিক স্থাপনা হয়। প্রথমে প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকারের নাগরিক বিমানচলন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1985 সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে এটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য কার্যালয় রয়েছে ব্যাঙ্গালোরে।

1977 সালের মে মাসে কাভালুরে এক মিটার প্রতিফলক দূরবীনটি স্থাপনার পর এখান থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। প্রথমটি ঘটে 1972 সালের জুন মাসে। 7 জুন তারিখে বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড একটি তারার সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় (যাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় occultation বলা হয়) এখান থেকে গৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সর্বপ্রথম গ্যানিমিডের ওপর হাল্কা বায়ুমণ্ডলের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল আরও চমকপ্রদ। সেটি ঘটে 1977 সালের 10 মার্চ তারিখে। সেদিন দেশ বিদেশের বেশ কয়েকটি মানমন্দির থেকে ইউরেনাসকে পর্যবেক্ষণের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণটা আর কিছুই নয়—সেদিন তুলারাশির একটি তারার সামনে দিয়ে ঐ গ্রহটি যাওয়ার কথা ছিল। ইউরেনাসের পেছনে চলে যাওয়ার ঠিক আগে ও পরে তারাটির আলোয় যে তারতম্য হয় তা বিশ্লেষণ করে গ্রহটির ওপরকার বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল ঐ পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য।

কাভালুরে সেদিন ঐ পর্যবেক্ষণের ভার ছিল আই আই এ'র বর্তমান ডিরেক্টর ডাঃ জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের ওপর। তিনি ও তাঁর সহকর্মী কুপ্পুস্বামী সেখানকার এক-মিটার দূরবীনে বিশেষ যন্ত্রপাতি লাগিয়ে ঐ ঘটনার অপেক্ষায় ছিলেন। ইউরেনাস তারাটির সামনে আসার সময়েই তাঁরা বুঝতে পারলেন একটা অদ্ভুত কিছু ঘটছে। প্রথমে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে হয়ত গ্রহটির নতুন কোনও উপগ্রহের

[শেষাংশ 13 পৃষ্ঠায়]

জানা-অজানার নানা খবর

বেশির ভাগ পাখি, বিশেষ করে যারা গাছের ডালে কিংবা পাথরের ফাঁক-ফোঁকরে বাসা বাঁধে তাদের ছানারা ডিম ফুটে বের হবার পর বেশ কিছুদিন ধরে খেয়ে দেয়ে বড় হয়ে ওঠার জন্য মা-বাবার ওপর নির্ভর করে। ডানার পালক গজিয়ে উড়তে শেখার পরও কিছুদিন মা তাদের খাইয়ে দেয়।

আর যে সব পাখি আকাশে উড়ে বেড়ানোর চেয়ে একটু মাঠ-ঘাট জল আর জলাভূমিতে চরে বেড়ায় তাদের ছানারা ডিম থেকে বেরিয়েই খাবার খুঁটে নেবার জন্য ছুটে বেড়ায়। হাঁস-মুরগীর বাচ্চাদের লক্ষ্য করে দেখো। পুকুরের ধারে ডাহুক বা ডাক পাখির ছানাগুলো যেন কালো কালো পশমী বলের মতো মায়ের পিছনে ছুটে বেড়ায়।

ভূগর্ভের রত্ন ঃ অরপিমেণ্ট

আর্সেনিক এমন একটি মৌল, যার মধ্যে ধাতু ও অধাতু—উভয়ের ধর্মই কিছু কিছু বর্তমান। সেই কারণে আর্সেনিককে ধাতুকল্প আখ্যা দেওয়া হয়। আর্সেনিকের অনেকগুলি আকরিকের মধ্যে 'অরপিমেণ্ট' অন্যতম। অরপিমেণ্ট হলো আর্সেনিকের সালফাইড যৌগ (AsS), যার মধ্যে আর্সেনিকের শতকরা পরিমাণ 61 ভাগ। অরপিমেণ্টের স্ফটিক মনোক্লিনিক শ্রেণীর। কখনও কখনও প্রিজমাকৃতি স্তম্ভাকার, এমন কি এর দানাদার স্ফটিকও মেলে। খনিজটির কাঠিন্য মোজ স্কেলের মাপকাঠিতে $1\frac{1}{2}$ থেকে 2। নিম্ন উষ্ণতায় তপ্তজল বাহিত শিলার শিরায় এর জন্ম। সাধারণতঃ রিয়্যালগার ও স্টিবনাইট নামক খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এটি পাওয়া যায়। খনিজটির রঙ উজ্জ্বল হরিদ্রাভ কমলা, কখনও সবুজাভ হলুদ, আবার কখনও বাদামী হরিদ্রাভ। স্ফটিক কখনও স্বচ্ছ, কখনও বা ঈষৎ স্বচ্ছ।

অরপিমেণ্ট-এর রঙিন ছবি

আর্সেনিকের ব্যবহার খুবই সীমিত। তামার সঙ্গে পরিমিত আর্সেনিক মেশালে সংকর ধাতুটির তাপসহন ক্ষমতা বাড়ে। এ ভিন্ন আর্সেনিক মেশানো তামার ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়। আর্সেনিকযুক্ত তামা, 'লোকো-মোটিভ ফায়ার বক্স' তৈরিতে 'ক্যালিকো প্রিন্টিং'-এর রোলার প্রস্তুতিতে এবং মোটর গাড়ির রেডিয়েটর প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। চামড়া থেকে লোম অপসারণের কাজে ট্যানিংএ, বাজি তৈরির কাজে এবং কীটপতঙ্গনাশক রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবেও অরপিমেণ্ট ব্যবহৃত হয়। অরপিমেণ্ট চূর্ণ আঠার সঙ্গে মেশালে সুন্দর হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং নীল (indigo)-এর সঙ্গে মেশালে সুন্দর সবুজ বর্ণ ধারণ করে। এই সব রং ভারতীয় ও ব্রহ্মদেশীয় অলংকারকে রঙিন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে এবং মুনসিয়ারী জেলায় অল্পস্বল্প অরপিমেণ্টের কেলাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তা থেকে আর্সেনিক মেলে না। বিদেশ থেকে তাই আমাদের অরপিমেণ্ট আমদানী করতে হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায়, নেভাদায়, টেক্সাসে, মণ্টানায়, অ্যারিজোনা ও কলেরাডো অঞ্চলে অরপিমেণ্ট পাওয়া যায় এ ভিন্ন কানাডা. কিউবা, ফ্রান্স. ব্রেজিল, স্পেন, জার্মানী, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও সোভিয়েত দেশে অরপিমেণ্ট খনিজটি মেলে।

অমরনাথ রায়

[10 পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু পরে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেল ইউরেনাসের চারপাশ ঘিরে শনির মত বলয় রয়েছে বলেই অননটি হয়েছে।

আই আই এ'র ইতিহাসে এ ছিল এক মহত্বপূর্ণ উপলব্ধি।

কোদাইকানাল ও কাভালুর মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ ছাড়াও আই আই এ'র বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন স্থান থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের অধ্যয়নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। 1970 সালে মেক্সিকোয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের কিরীটমণ্ডলের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ডঃ ভট্টাচার্য ও ডঃ বাপু সর্বপ্রথম তাতে কম তাপমান এলাকার সন্ধান পান। এর আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে পুরো কিরীট-মণ্ডলটাই অতি উচ্চতাপমান বিশিষ্ট (10 লক্ষ ডগ্রী) আয়নিত হাইড্রোজেনের তৈরি। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এ আবিষ্কারও পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন।

সম্প্রতি আই আই এ এবং রমন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগে ব্যাঙ্গালোরের কাছে গৌরিবিদানুরে এক বিশাল রেডিও দূরবীন তৈরি করা হয়েছে যাতে করে মহাকাশ থেকে আসা 10 মিটার (ডেকা মিটার) দৈর্ঘের রেডিও তরঙ্গ গ্রহণ করা যায়। সারা বিশ্বে এটাই হল এ ধরণের সব চেয়ে বড় রেডিও দূরবীন। এতে করে ব্রহ্মাণ্ডে ঘটিত বহু অজানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে।

কাভালুরে 234 সেণ্টিমিটার দূরবীনটি চালু হওয়ার পর সেখানে মোট দূরবীণের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ছয়। বাকি পাঁচটি দূরবীনের আয়নার ব্যাস যথাক্রমে 100 সে.মি., 75 সে.মি., 60 সে.মি., 40 সে.মি. এবং 38 সে.মি.। কেবলমাত্র 100 সে.মি. দূরবীনটি বিদেশ থেকে আনা, বাকি সবকটি দেশেই তৈরি। এছাড়া 234 এবং 100 সে. মি. দূরবীন দুটিতে গৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য কমপিউটারও এখানে রয়েছে।

কাভালুরের বৃহত্তম দূরবীনটি দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডের আরও বহু দূরের নক্ষত্রমণ্ডল, গ্যালাক্সি ইত্যাদির অধ্যয়ন করতে পারবেন। তবে 'আই আই এ'র বর্তমান কার্যসূচী অনুসারে, আপাতত বিজ্ঞানীরা এই দূরবীণের সাহায্যে প্রধানত আমাদের ছায়াপথ বা Milky Way Galaxy-র বিশদ অধ্যয়ন চালাবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছায়াপথের মধ্যে তারাদের জন্ম বা উৎপত্তি কোথায় হয় তা খুঁজে বের করা। এ বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে আজও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

74F কলেজ রোড নিউদিল্লী-2

ঐতিহ্য ও আধুনিকতায় অনবদ্য

তন্তুশ্রী

বাংলার সেরা তাঁতের কাপড়

- ন্যায্য দামে তাঁত বস্ত্র সম্ভার সংগ্রহের অপূর্ব সুযোগ।
- সেরা জাতের ছাপা সিল্ক শাড়ী।
- বাংলা তাঁতের শাড়ীর মনমাতানো রং আর ডিজাইনের আকর্ষণীয় সমাহার।
- পলিয়েষ্টার, সিল্ক শার্টিংস, তসর এবং সুতি শার্টিংস, ধুতি ও লুঙ্গী।
- তাঁত ও ছাপা বেডশীট, বেডকভার এবং রংবেরঙের কম্বল।

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ

কলিকাতা, ত্রিপুরা (আগরতলা) নিউ দিল্লী, মাদ্রাজ, সিমলা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল-হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম

ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

(পঃ বঃ সরকারের সংস্থা)

৬-এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৭ম তল), কলিকাতা-১৩

অভিযান

এক দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযান

সুবীর দত্ত

1870 সালের কথা। স্টোলটেলহফ্ ভাতৃদ্বয় বাজী ফেলে সীল মাছ শিকারে বেড়িয়ে পড়লেন দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে। সমুদ্রে পথ হারিয়ে তারা আশ্রয় নিলেন 'দুর্গম' নামে এক দ্বীপে। অনেকদিন তাদের কোন খবর কেউ রাখেনি।

দুবছর পর কাছাকাছি ট্রিস্টাম দ্বীপে নোঙ্গর ফেললো 'চ্যালেঞ্জার নামে একটা বড় জাহাজ। নাবিকরা জানতে পারলো সেই দুই ভায়ের কথা। আর তখনই জাহাজটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল 'দুর্গম" দ্বীপে। পাওয়া গেল দু-ভাইকে। এই দুবছর তারা পেঙ্গুয়িনের আর বুনো শুওরের মাংস পেয়ে দিব্যি বেঁচে ছিলেন। অবশ্য সীল মাছ আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি। 'চ্যালেঞ্জার' জাহাজের যাত্রীদের প্রতি তাঁরা সারাজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ।

1872 সালের 21শে ডিসেম্বর। ইংল্যাণ্ডের পোর্টস্-মাউথ বন্দর থেকে রওয়ানা হয়েছিল এইচ. এম. এস. চ্যালেঞ্জার। 2300 টন ওজনের বাষ্পচালিত জাহাজটা ছিল আদতে 18টি কামানবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ। এতে এবার তোলা হল শব্দের মাধ্যমে জলের গভীরতা মাপার যন্ত্র আর 14 মাইল লম্বা দাড় এবং $12\frac{1}{2}$ মাইল লম্বা তার; সমুদ্রতলের নমুনা সংগ্রহ করার ও জলের তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রাদি, নেট, ড্রেজ, একটা ছোট লাইব্রেরী, শত শত বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। সেজন্য শুধুমাত্র দুটো কামান রেখে বাকীগুলো খুলে ফেলা হল। এবারের অভিযান রীতিমত 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান'। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সমুদ্রের গভীরতা এক রহস্যের বস্তু ছিল। "বিগল" জাহাজে 1831 সালে বিশ্ববিখ্যাত প্রাণী-বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের অভিযানের পর এই 'চ্যালেঞ্জার' এর যাত্রা। কাজ অনেক। সমুদ্রের গভীরতা মাপা। সমুদ্রতলের নমুনা সংগ্রহ করা। সমুদ্রের গভীরের তাপ-মাত্রা ও সমুদ্রের আবহাওয়া জানা, ইত্যাদি।

পোর্টসমাউথ থেকে বেরিয়েই জাহাজটা একটা ঝড়ের মুখে পড়েছিল। অভিযানের নেতা এডিনবারার ন্যাচারাল ফিলসফির প্রফেসর চার্লস ওয় ইভিল থমসন এতে ভয়তো পেলেননা, বরং বললেন— ভালই হল, এতে জাহাজের কলকব্জা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া যাবে'। যাত্রার প্রথম স্তরে বারমুদা পর্যন্ত সমস্ত কাজকর্ম ও যন্ত্রপাতি ঝালিয়ে নেওয়া হল। কতগুলো গতানুগতিক মাপজোক, যেমন জলের গভীরতা, বিভিন্ন স্তরে তাপমাত্রা, আবহাওয়ার অবস্থা, সমুদ্রে স্রোতের গতি ও মাত্রা এসব নেওয়া হল। সমুদ্র তল থেকে 'ড্রেজ' নামক যন্ত্রের মাধ্যমে তুলে আনা হল কিছু নমুনা—গাছপালা ও প্রাণী সহ। সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরের প্রাণীর অবস্থান জানার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হল।

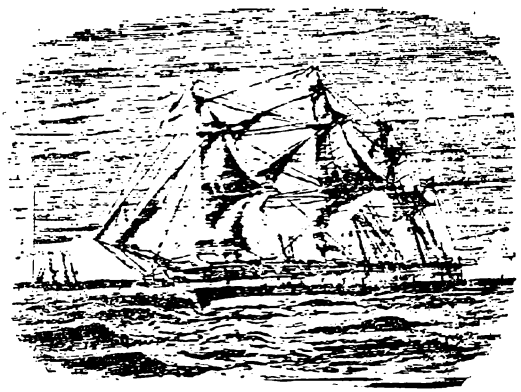

একটা লাটাইয়ের মতো ড্রামে জড়ানো তার। তারের মুখে একটা বিশাল বালতির মতো বস্তু (যাকে 'ড্রেজ' বলা হয়) বেঁধে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের নীচে। সমুদ্রতল ছোঁয়ার পর জাহাজের সাথে তাকে আস্তে আস্তে টেনে আনা হয়। তারপর লাটাই গুটিয়ে ড্রেজটাকে এনে জাহাজের ডেকে তোলা হয়। চ্যালেঞ্জারের জনৈক নৌ-অফিসার মজা করে লিখেছেন যে তাদের তো গভীর সমুদ্রে ড্রেজিং এর সময় ডেকে দাঁড়িয়ে 10 থেকে 12 ঘণ্টা ধরে যন্ত্রপাতি চালাতে হতো, আর বিজ্ঞানীরা ড্রেজ ওপরে ওঠার খবর পেয়ে দৌড়ে এসে নতুন কোন পোকা, প্রবাল বা অমেরুদণ্ডী প্রাণী দেখে উল্লসিত হতেন, নমুনা সংগ্রহ করে কেবিনে গিয়ে আরাম করতেন।

'দুর্গম' দ্বীপ ছেড়ে জাহাজ গিয়েছিল নাইটিঙ্গল্ দ্বীপে। সেখানে হাজারে হাজারে পেঙ্গুইন এসে অভ্যর্থনা জানালো। সমুদ্র সৈকত পুরোটাই ছিল পেঙ্গুইনের ডিমে ঢাকা। ফলে কয়েকটা না ভেঙে কেউই তীরে উঠতে পারেনি। পেঙ্গুইনরা এ্যাতো ক্ষেপে গিয়েছিল যে জাহাজের একটি কুকুর তাদের হাতে প্রাণ হারায়।

কেপ হর্ণ ছাড়িয়ে, ম্যারিয়ন দ্বীপে চ্যালেঞ্জারের যাত্রীরা

দেখলো লক্ষ লক্ষ সাদা এ্যালবট্রেস্ পাখী। কিন্তু পুরোনো নাবিকদের সাবধানবাণীকে মনে রেখে তারা একটাকেও প্রাণে মারলো না। এটা একটা ব্যতিক্রম ছিল, কারণ তারা যেখানেই নেমেছেন স্থানীয় গাছপালা ও জীব-জন্তুর নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

ফিট। প্রশান্ত মহাসাগরে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর চ্যালেঞ্জার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং তাহিতিতে থাকে এবং ম্যাগেলন প্রণালীর ভেতর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকাকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর উত্তরে ঘুরে দক্ষিণ ও উত্তর আটলান্টিক পার হয়ে 24শে মে, 1876 সালে ইংল্যান্ডের

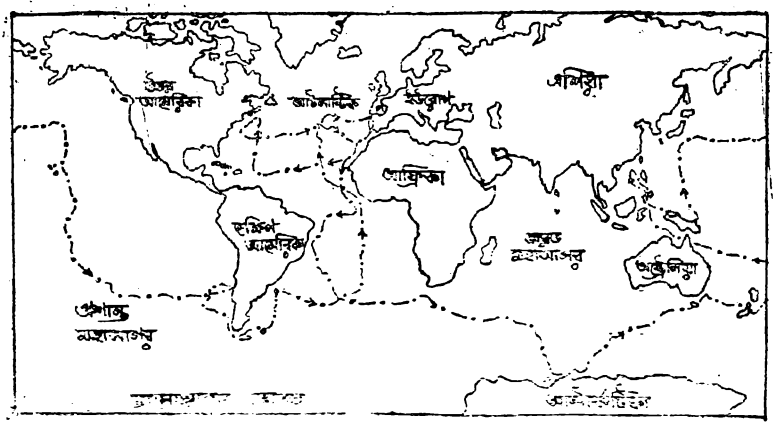

এবার চ্যালেঞ্জার ভারত মহাসাগরের দক্ষিণভাগে। এবং এটাই সে সময় বিশ্বের প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ যেটি "আন্টার্কটিক সার্কল" পার করেছে। বড় বড় বরফের চাঁইকে এড়িয়ে যাবার সময় জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে। বাতাস চলছিল ঘণ্টায় 42 মাইল বেগে। রাত এগিয়ে আসায় জাহাজ একটা বিশাল বরফের চাঁইয়ের পাশে নোঙর ফেলে। কিন্তু হঠাৎই লাগে প্রচণ্ড ধাক্কা এবং জাহাজ কোন মতে রক্ষা পেলেও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরপর কাজ করতে করতে জাহাজ অস্ট্রেলিয়া, নিউজি-ল্যান্ড এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে যায়। ফিজিতে রাজা থাকোম্বু নামে একজন ধর্মান্তরিত খৃষ্টানের সাথে জাহাজের যাত্রীদের সাক্ষাত হয়। এই রাজা কিছুদিন আগে এক বন্দীর জিভ কেটে তার সামনেই রেখেছিল এবং পরে বন্দিটাকেই খেয়ে ফেলে।

তারপর ফিলিপাইন, জাপান ও চীন। 23শে মার্চ, 1875 এ ম্যারিয়ানা দ্বীপের কাছে 'রেকর্ড' হয়—সমুদ্রের সবচেয়ে গভীরে শব্দের মারফৎ গভীরতা মাপা—16,840

স্পিটহেড বন্দরে ফেরে।

সাত সমুদ্রে 68,890 মাইল অতিক্রম করে, 14 কোটি বর্গ মাইল ব্যাপী সমুদ্রতলে ছড়ানো 360টি স্টেশন থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে সাড়ে তিন বছর পর চ্যালেঞ্জার ঘরে ফিরলো। সে ফিরলো আর্কটিক ছাড়া সমস্ত সমুদ্রের গভীরতা মেপে। সমুদ্রতলের বিশাল রহস্য উদ্ঘাটন করে। এবং এসবই ঘটেছিল আজ থেকে 113 বছর আগে।

চ্যালেঞ্জার 240 জন নাবিকদের মধ্যে 7 জন পথে মারা গিয়েছিলেন, তার মধ্যে 2 জন জলে ডুবে, একজন পীত-জ্বরে এবং বাকীরা দুর্ঘটনা বা অন্যান্য কারণে।

সমস্ত সংগৃহীত তথ্যাদি একত্রিত করে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হল 50 খণ্ডে। গভীরতা মাপা ছাড়াও চ্যালেঞ্জারের বড় অবদান ছিলো সমুদ্রের প্রাণীজগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা। তাছাড়া সমুদ্র বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখানো আছেই।

এভাবে বিশ্বে সমুদ্রবিজ্ঞানের সূচনা ঘটল।

AF 189 সেক্টর। -সল্টলেক সিটি, কলকাতা-64

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের
বাঙলার গাছপালা
প্রকাশিত হয়েছে। দাম ১০ টাকা
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮৬/১ মহাত্মাগান্ধী রোড, কল-৯

বুদ্ধি নিয়ে খেলা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

এক : বুদ্ধির বাহাদুরী

নীচের ছবিটা খুব ভাল করে লক্ষ্য কর। এই ছবির যে সমস্ত জায়গায় কালো ডট রয়েছে সেখানে ছ'টা ছুঁচলো পিন তোমাকে বসাতে হবে। কিন্তু মনে রাখবে যে কোনও দুটো পিন এক লাইনে থাকবে না—তা সে কোণাকুণি, অনুভূমিক (horizatal) বা খাড়াভাবে (vertical) তুমি যে দিক থেকেই দেখ না কেন।

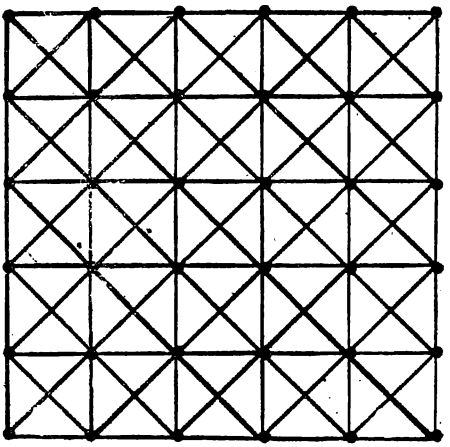

দুই : ব্যালান্সের খেলা

তোমরা সার্কাসে কতো ব্যালান্সের খেলা দেখেছ—তাই না? সাইকেলের ব্যালান্স, সরু দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ব্যালান্সের খেলা, ট্রাপিজের ব্যালান্স - এই রকম আরও কত কি! এখানে তোমাদের একটা ছোট্ট ব্যালান্সের খেলা বলা হয়েছে। তোমরা মাথা খাটিয়ে চেষ্টা করে দেখতো এটা পারো কিনা। একটা গেলাসের দুপাশে ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেইরকম দুটো এক টাকার মুদ্রা রয়েছে। মনে রাখবে গ্লাস ভর্তি জল রয়েছে কিন্তু। একই সময়ে এক হাতের সাহায্যে তুমি ঐ এক টাকার মুদ্রা দুটিকে গেলাসের উপর তুলতে পারবে? কি অসম্ভব মনে হচ্ছে? আচ্ছা, একবার চেষ্টা করে দেখই না!

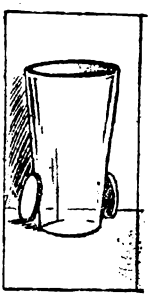

তিন : গিঁট আটকাবে কোন ছবিতে?

নীচে তিনটে দড়ির ছবি আঁকা হয়েছে (a), (b) ও (c); তোমরা মাথা খাটিয়ে বলতে পার কোন দড়ির প্যাঁচে গিঁট পড়বে?

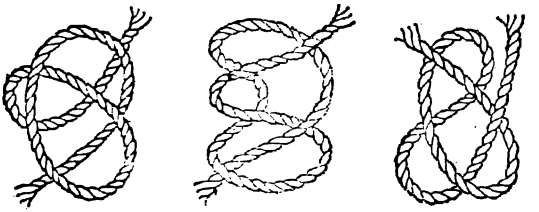

বুদ্ধিনিয়ে খেলার উত্তর

এক উত্তরের ছবি দেখ।

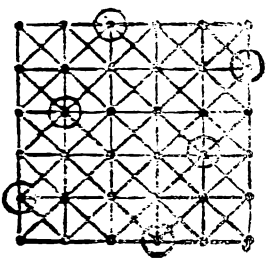

দুই উত্তরের ছবি দেখ।

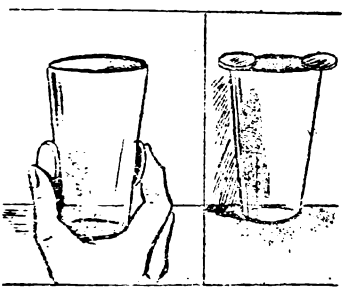

তিন একমাত্র (b) ছবিতেই গিঁট পড়বে; (a) ও (b) এর ফাঁস খুলে যাবে।

R H S ফ্লাট 8, সাহাপুর হাউসিং এস্টেট, নিউ আলিপুর।

কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের কবলে

মানস কুন্ডু

"ডঃ স্যামুয়েল, ওর কি বাঁচবার সামান্য আশাও নেই ?" মিসেস রবার্টসের প্রশ্নে চমকে ওঠেন স্যামুয়েল। মাত্র পঁচিশ বছর বয়স থেকে ডাক্তারি করছেন ডঃ স্যামুয়েল। আজ তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো রোগী তিনি পান নি যার রোগ তিনি চিনতে পারেন নি। সময় মতো এসেও রোগী মারা গেছে এমন ঘটনা একটাও ঘটে নি। চল্লিশ বছর ধরে অপরাজিত নায়কের মতো ডঃ স্যামুয়েল যুদ্ধ করেছেন রোগের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর প্রত্যেকে তাঁর নাম জানে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার হিসেবে। কিন্তু তাঁরই চোখের সামনে চব্বিশ বছর বয়সের এক তরুণ (ডঃ স্যামুয়েল চব্বিশ বছর বয়সী মিঃ রবার্টসকে তরুণ ভাবতেই অভ্যস্থ) মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। তিনি কিছুই করতে পারছেন না। রোগটি যে কি তাও সনাক্ত করতে পারেন নি এখনও। তাই জীবনে বোধ হয় এই প্রথম রোগীর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন ডঃ স্যামুয়েল। বাইরের দৃশ্যের দিকে চোখ রেখে (অবশ্য বাইরের দৃশ্য বলতে পর্দায় একটানা ছুটে যাওয়া অসংখ্য নক্ষত্রের আলো) ডঃ স্যামুয়েল ভাবছিলেন মিঃ রবার্টস্ আর অজানা রোগটি সম্পর্কেই। চমক ভাঙে মিসেস রবার্টসের কণ্ঠস্বরে। ডঃ স্যামুয়েল মিসেস রবার্টসের দিকে তাকিয়েই আস্তে আস্তে আবার চোখ ফিরিয়ে নেন টি. ভি-র পর্দায়। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ঘনঘন টান দেন চুরুটে। কোন উত্তর দিলেন না। মিসেস রবার্টসের জ্ঞানের কাছাকাছি কেউ নেই। মহাকাশ বিজ্ঞানে যেন ওর জন্মগত অধিকার। ওর কঠিন কঠিন তত্ত্ব অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও বুঝতে পারে না অনেক সময়।

মিসেস রবার্টসের বয়স যখন মাত্র সতের, লীনা নামে ডাকত সবাই। পুরোনাম লীনা ডেভলীন। ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব সুন্দর কবিতা লিখত লীনা। সতের বছর বয়সেই লীনার কবি হিসেবে বেশ নামডাক হয়। অথচ ছাত্রী সে বিজ্ঞানের। অবশ্য বিজ্ঞান বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেনি ও গভীরভাবে। ওই সময়েই মিঃ রবার্টসের একটা প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হয় লীনা। শুরু হয় ওর নতুন জীবন। মাত্র একুশ বছর বয়সেই লীনা আবিষ্কার করে এক নূতন তত্ত্ব-মহাকাশে বিভিন্ন জীবের মানসিক পরিবর্তন এবং সফল মহাকাশ যাত্রা সম্পর্কে।

এই সময়েই ওর সাথে আলাপ হয় মিঃ রবার্টসের, তারপর বিয়েও হয়ে যায় মাস দুয়েকের মধ্যে। এর কিছু-

দিনের মধ্যেই লীনা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায় নিজের আবিষ্কারের জন্য। কিন্তু কিছুদিন পরেই সব কেমন যেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। লীনার স্বামী জন অর্থাৎ মিঃ রবার্টস আশংকা করেন একটি অজানা নক্ষত্র প্রচন্ড বেগে ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। আর তাতে পৃথিবীর ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যায় আশংকাটি সত্যি। সব বিজ্ঞানীদের তখন মাথায় হাত। তাহলে পৃথিবীকে বাঁচানোর কি কোনো উপায়ই নেই? অথচ সাধারণ মানুষ যদি একথা জানতে পারে তাহলে যে সর্বনাশের চূড়ান্ত হবে। চারিদিকে শুরু হবে বিশৃংখলা। তাই সব দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে মতামত দিলেন একথা পৃথিবীর স্বার্থেই সাধারণ মানুষদের জানানো চলবে না। অথচ শেষের সে দিনের জন্য একেবারে চুপচাপ বসে থাকাও সম্ভব নয়। তাই সারা পৃথিবী থেকে চব্বিশজন সেরা সেরা বিজ্ঞানী এবং ডঃ স্যামুয়েল মোট পঁচিশজন রওনা হয়েছেন পৃথিবীর পানে দুরন্ত বেগে ছুটে আসা নক্ষত্রটির দিকে। অবশ্য এগিয়ে গিয়েই যে কোনো লাভ হবে তারও স্থিরতা নেই। তবু কিছুতো করতে হবেই। এই রকম অবস্থার মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন মিঃ রবার্টস। তাও এমনি এক অসুখ যারপরিচয় জানেন না ডঃ স্যামুয়েল। অথচ হাতে আছে সময় মাত্র সাতদিন। আর মাত্র সাতদিন পড়েই নক্ষত্রটি আছড়ে পড়বে পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর কোনো চিহ্নই বুঝি থাকবে না তখন আর।

চিন্তান্বিত মুখে ডঃ স্যামুয়েল মিঃ রবার্টসের কেবিনের দিকে এগোতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে যেতে থাকে ক্ষীণদেহী লীনা এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে। কেবিনে ঢুকে মেডিক্যাল রিপোর্ট, এক্সরে, ইউ. জি. সি তে চোখ বুলোতে বুলোতে আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন ডঃ স্যামুয়েল। লীনা কান পেতে শোনে ডঃ স্যামুয়েলের আপন মনের কথাবার্তা। "এ অসম্ভব। সারা দেহের নার্ভগুলো কোনো কাজ করছে না। মাথা ছাড়া সব জায়গায় রক্ত চলাচল শতকরা এক ভাগেরও অনেক কম। মস্তিষ্কের ধূসর অঞ্চলে রক্ত চলাচল হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে সদামৃত ব্যক্তির সঙ্গে পার্থক্য নেই এমন কিছু। হার্ট এবং ফুসফুস দুয়েরই অবস্থা শোচনীয়। মিনিট পনের পরপর একবার হৃদস্পন্দন হচ্ছে। তাও খুবই আস্তে।"

নাঃ এমন রোগীর কথা ডঃ স্যামুয়েল শোনেন নি সারা জীবনে।

লীনা ফিসফিস করে বলে, "ডঃ! জনের মাথার পেছন দিকটা আমার কাছে একটু বড় লাগছে। ডঃ স্যামুয়েল রবার্টসের মাথার পেছনে হাত দিয়ে বললেন "এতো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে।" লীনা বেশ জোরের সঙ্গেই বলে, "না ওর স্বাভাবিক মাথার চেয়ে পেছনটা একটু বড় লাগছে।" ডঃ স্যামুয়েল কতকগুলি যন্ত্রপাতি নিয়ে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, "মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুর মধ্যে কিছু অজানা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। রক্ত চলাচলও বেশি হচ্ছে। আর তার ফলেই এটি হয়েছে।"

লীনা কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় চারজন বিজ্ঞানী কন্ট্রোল রুমের দিকে যাচ্ছেন প্রত্যেকের মুখেই ম্লান ছায়া। লীনা বুঝতে পারে মনের এই অবস্থায় অনেকেই ভেঙে পড়ছে। লীনা নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করে। অথচ আর মাত্র সাতদিন সময় আছে হাতে।

পরপর আরো চারটি দিন কেটে যায়, সমাধানের পথ বের করতে পারে না কেউ। আর মাত্র তিনদিন পরে পৃথিবীর ধ্বংস। আর বার ঘন্টা পর যানটি পৌঁছে যাবে ছুটে আসা নক্ষত্রটির কাছাকাছি। তারপর নিরাপদ দূরত্বে থেকে নক্ষত্রটির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দিকেই যেতে থাকবে মহাকাশ যানটি।

বারোটি ঘন্টা সময় কেটে যায় নীরব প্রতীক্ষাতেই। মিনিটে মিনিটে ডঃ স্যামুয়েল মাথা নাড়েন, 'রোগীর অবস্থা একই। আপনাদের ক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করুন পৃথিবীকে বাঁচাতে।' কিন্তু প্রত্যেকেই ভেঙে পড়েছেন কোনো পথ না পেয়ে। লীনা সাহস যোগায় সবাইকে 'জন বলত চিন্তা করলে যে কোনো সমস্যা সমাধানের উপায় বেরোবেই।' লীনার কণ্ঠস্বরও কেঁপে যায় যেন শেষের দিকে। কণ্ঠস্বরে জোর নেই। ডঃ স্যামুয়েল এগিয়ে যান জনের ঘরের দিকে। মহাকাশযান ছুটে চলেছে পৃথিবীর দিকে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা মৃত্যু নক্ষত্রটির সঙ্গে সমান দূরত্ব রেখে একই গতিবেগে।

হঠাৎ ডঃ স্যামুয়েল পাগলের মতো বাইরে ছুটে এসে চিৎকার করে বলেন, 'লীনা, স্টিভেনস, ওয়াকার সবাই শোন জন সেরে উঠেছে।" এক মুহূর্তে চব্বিশটি প্রাণী একত্রে এসে দাঁড়ায়। সবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি ডঃ স্যামুয়েলের দিকে এ কি করে সম্ভব হল? ডঃ স্যামুয়েল বুঝিয়ে দেন, "তোমরা নিশ্চই ভারতীয় মুনি-ঋষিদের কথা শুনেছ যারা ধ্যানমগ্ন হয়ে বেঁচে থাকতেন হাজার হাজার বছর। এই সময়ে তাঁদের হৃদস্পন্দন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। জনও প্রচন্ড একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করছিল। আর তার ফলেই বন্ধ হয়ে যায় ওর দেহের সব স্বাভাবিক কার্যকলাপ। পরিবর্তে অসম্ভব সক্রিয় হয়ে ওঠে মস্তিষ্কের ধূসর অঞ্চল। ধূসর অঞ্চলে মাঝে মাঝে বেশি রক্ত যাওয়ার ফলেই মাথার পেছন দিকটা ফুলে গিয়েছিল।" সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মিঃ রবার্টসের সুস্থতায়। লীনা কিন্তু ভুলতে পারে না পৃথিবীর বিপদের কথা। ডঃ স্যামুয়েলকে লীনা প্রশ্ন করে, 'জন কি পৃথিবীকে বাঁচাবার পথ খুঁজে বের করতে পেরেছে?' ডঃ স্যামুয়েলের মুখ কালো হয়ে ওঠে। আপন মনেই যেন বলে ওঠেন 'তা তো জিজ্ঞেস করি নি।'

লীনা এবং আর সবাই প্রবেশ করেন রবার্টসের

কৌষিনে। লীনাকে দেখেই জন প্রশ্ন করে, "আর কতক্ষণ সময় হাতে আছে আমাদের ? লীনা উত্তর দেয়, 'আটচল্লিশ ঘণ্টার কিছু বেশি সময়।' কণ্ট্রোল রুমের ডিরেক্টর ডঃ ওয়াকার অস্থির হয়ে প্রশ্ন করেন, 'মিঃ রবার্টস আপনি কি কোনো সমাধান খুঁজে পেয়েছেন ?' জন নিজের তর্জনীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলতে থাকেন 'একটা সমাধান পেয়েছি, কিন্তু আমাদের যানটা তাতে ধ্বংস হবে। আমরা আমাদের যানটি নিয়ে ধাক্কা দেব একটি ছোট্ট উপগ্রহে। ফলে এটি কক্ষচ্যুত হবে। তার ফলে উপগ্রহটি এর পাশের অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহটিকে ধাক্কা দেবে, কারণ মহাকাশের সূত্র থেকেই এটা আমাদের জানা যে মহাকাশে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেককে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের পরিমাণ বস্তুর ভরের ওপর নির্ভর করে। আমাদের মহাকাশযানের ভর খুব কম হওয়ায় আমরা সরাসরি নক্ষত্রটিকে ধাক্কা দিয়ে এর গতিপথ পরিবর্তন করাতে পারব না। তাই প্রথমে ছোট্ট একটি উপগ্রহকে ধাক্কা দেব। এটি আকর্ষণ বলের জন্য পাশের গ্রহটির গায়ে গিয়ে পড়বে। তারপর ঐ গ্রহটিই ছুটে চলা নক্ষত্রটির গতিপথ পরিবর্তন করে দেবে। এর পুরো হিসেবই আমার করা হয়ে গেছে। তবে এজন্য আমাদের সবাইকে মরতে হচ্ছে কেননা আমাদের মহাকাশযানটিই ধাক্কা দেবে প্রথম ছোট্ট উপগ্রহটিকে। ঠিক উপগ্রহটিরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে।"

নিজেদের মৃত্যু জেনেও প্রত্যেকেই আনন্দিত হয়ে ওঠে। প্রিয় পৃথিবীকে বাঁচাতে পারার আনন্দে সঙ্গে সঙ্গে সবাই রাজি হয়ে যায় জনের প্রস্তাবে। লীনা বলতে থাকে। 'আপনারা বোধ হয় আমার গবেষণার বিষয়টা ভুলে গেছেন। এই মহাকাশ যাত্রাকে সফল করার জন্য আরো একটি মহাকাশযানের প্রয়োজন যদি হয় তা যেন সঙ্গে সঙ্গেই করা সম্ভব হয় তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পৃথিবী থেকেই করে নিয়েছিলাম। আপনারা পৃথিবীর সমস্যাটা নিয়ে এত বেশি ভাবছিলেন যে কেউ লক্ষই করেন নি। তাতে করে বোধহয় আমরা পঁচিশজন কোনোমতে বেঁচে থাকতে পারব। লীনার কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ডঃ স্যামুয়েল, "লীনা! তোমার জন্যই আজ চব্বিশটা তাজা প্রাণ বাঁচল।" জন ডঃ স্যামুয়েলকে ঠাট্টা করে, "দুঃখ করবেন না, পঁচিশজনই বলুন। আপনার বয়সটাও এমন কিছু বেশি নয়।"

ঘণ্টা খানেক পর প্রথম মহাকাশযানটি থেকে বেরিয়ে আসে দ্বিতীয় আরেকটি মহাকাশযান। প্রথমটি এগিয়ে যেতে থাকে একটি ছোট্ট উপগ্রহকে লক্ষ করে।

আপনি কি কোন সমাধান খুঁজে পেয়েছেন ?

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ছাত্রাবাস মহাবিদ্যালয়। রহড়া, 24 পরগনা।

কর্কট নীহারিকার বুকে

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

উপ পারমাণবিক কণা 'ট্যাকিয়নের' শক্তিতে মহাকাশযান 'অভিযাত্রী' আলোর চেয়ে অনেক বেশি গতিতে পৃথিবী থেকে চার হাজার আলোক বর্ষের দূরত্বের কর্কট নীহারিকা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছিল। উদ্দেশ্য 'নোভা' সংক্রান্ত বিষয়ে নানান তথ্য সংগ্রহ করা। এ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ দূর থেকেই এ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে এসেছে। এবার সে আহরণ করবে বাস্তব জ্ঞান।

'অভিযাত্রীর' কণ্ট্রোলরুমের দেওয়াল জোড়া টি. ভি. র পর্দায় অসংখ্য জানা অজানা নক্ষত্রের ছবি ফুটে উঠেছে। কেউ উজ্জ্বল, কেউ উজ্জ্বলতর। কেউবা মিটমিটে। আর সামনে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হচ্ছে বিশাল উজ্জ্বল কুয়াশাময় এক জগৎ। সে কুয়াশা লম্বায় ছ' আলোকবর্ষ চওড়ায় সাড়ে তিন আলোকবর্ষের সমান। এই নীহারিকার কেন্দ্রে রয়েছে আমাদের সূর্যের মত এক হলুদ সূর্য আর একটা অতি ছোট অতি উজ্জ্বল বামন সূর্য। দুটো নক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। অর্থাৎ ওরা জোড়া সূর্য।

ধীরে ধীরে টি. ভি. র পর্দায় কুয়াশা পুঞ্জের ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকল। এতক্ষনের দৃশ্যমান তারার দল কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যেতে বসল। অতি উজ্জ্বলদের শুধুমাত্র মিট মিটে দেখাতে থাকল। ত্রিমাত্রিক ফটোগ্রাফীতে দেখা গেছে এই কুয়াশাপুঞ্জের ভেতর অনেক ফাঁক রয়েছে। এই রকমই একটা ফাঁকা জায়গার ভেতর দিয়ে অভিযাত্রী ঢুকে পড়ল সেই কুয়াশাময় গ্যাসের জগতে।

যন্ত্রপাতির নির্দেশ দেখে ক্যাপ্টেন রঘুবীর ভট্টাচার্য সন্তোষ প্রকাশ করলেন। নীহারিকার এ অঞ্চলটা মহাশূন্যের মতই শূন্য। তবু একেবারে শূন্য নয়। ফলে, আলোর চেয়ে উচ্চ গতিতে যাওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। যে-কোন মুহূর্তে কোন গ্যাসের পরমাণুর সঙ্গে সংঘাত ঘটতে পারে। আর ঐ গতিবেগে সামান্য এক অণুর সঙ্গে সংঘাতই 'অভিযাত্রী'র ধ্বংস সূচনা করতে পারে। ফলে মহাকাশ যানের গতি অনেক অনেক কমিয়ে আনা হল। নিয়ন্ত্রিত গতিবেগে 'অভিযাত্রী' যেন এক সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকল। সেই সুড়ঙ্গের দেওয়াল গুলো উজ্জ্বল গ্যাসপুঞ্জ দিয়ে তৈরি। ঘনত্বে যা যে কোন ধূমকেতুর লেজের চেয়েও কম ঘন।

কণ্ট্রোল রুমে বসে টি. ভি. র পর্দায় এই অজানা জগতের ছবি দেখছিলেন ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য আর মহাকাশ যানের ত্রিমাত্রিক ফটোগ্রাফ বিশেষজ্ঞ বাইশ বছরের রাকেশ সাকসেনা। কর্কট নীহারিকার অভ্যন্তরের ভয়াল সৌন্দর্য দেখে তারা মুগ্ধ হচ্ছিলেন। হঠাৎই 'অভিযাত্রীর' বিপদ ঘন্টি বেজে উঠল। গতিবেগ একেবারেই কমে এল। স্বয়ংক্রিয় সন্ধানী রশ্মি কুয়াশার বুকের একটা বিশেষ জায়গার ছবি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়ে তুলল টি. ভি. পর্দায়

[শেষাংশ 45 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

মনে হচ্ছে এবার ওরা কিছুটা শিক্ষার আলো পাবে। চড়ুই পাখি কিন্তু ভীষণ ছটফটে! সুযোগ পেলেই ফুরুৎ।
আমার হাত থেকে পালানো অত সস্তা নয়। ওকে আমার পড়ার ঘরে রেখেছি
পড়ার ঘরে! খাঁচা কোথায় পেলি?
খাঁচা কি হবে? আমি অনেক দেখেছি, খাঁচাতে রাখা সত্ত্বেও কেমন করে যেন খাঁচা খুলে পাখি পালিয়ে গেছে!
আমি পাখিটাকে আমাদের বইয়ের ঐ আলমারিতে রেখেছি।
আলমারিতে পাখি! কোথায়?
ঐ তো — ওমা একি! পাখিটা অমন—
পটল তুলেছে!
পটল, সেকি! কেন? আমি তো ওর কোন অভাব রাখিনি!
ও মরেছে অক্সিজেনের অভাবে।
অক্সিজেন! ও আমি পাব কোথায়?
অক্সিজেন পাব কোথায়! গোমুখ্যুকোথাকার! অক্সিজেন জান না?

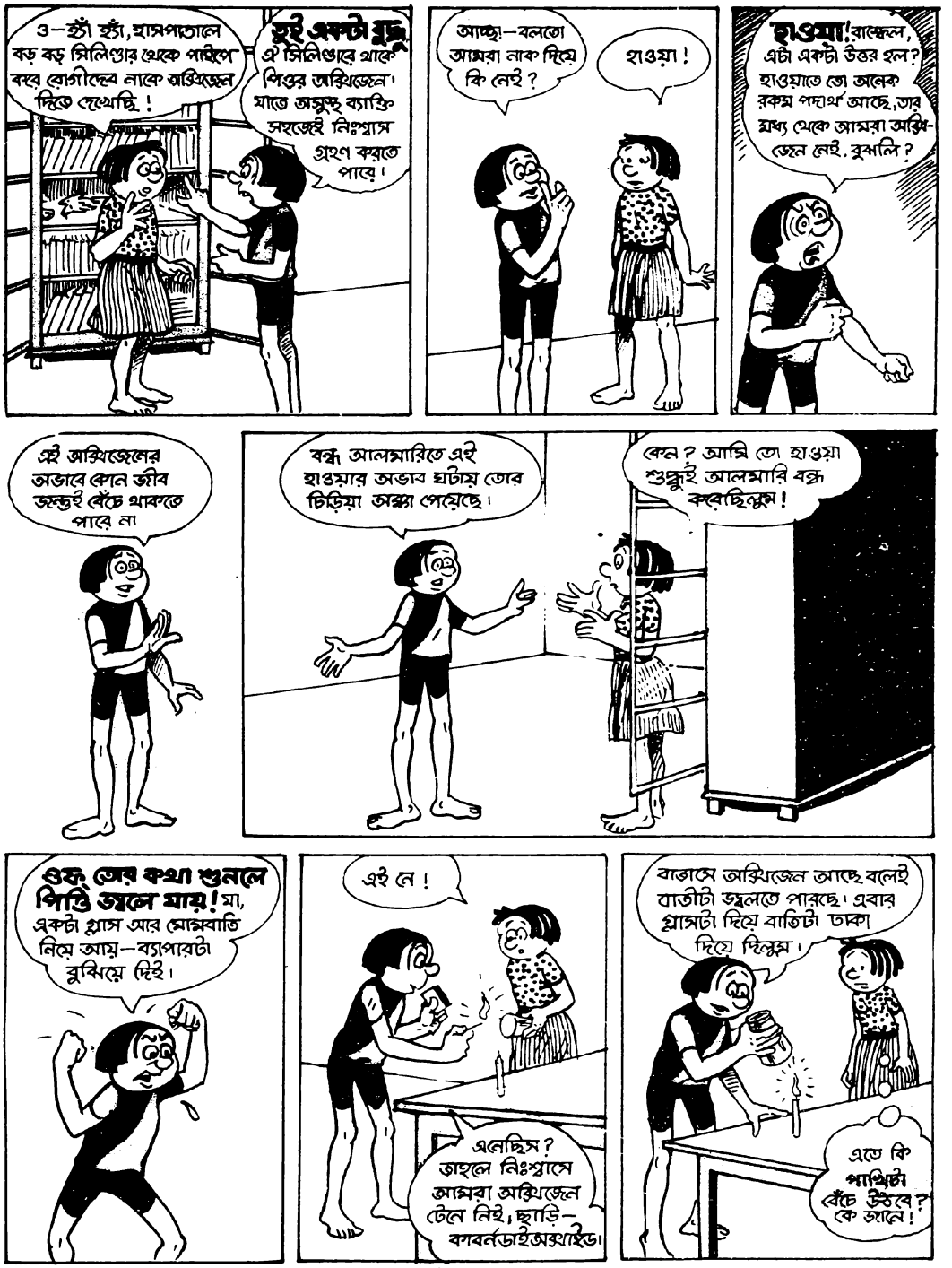
ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, হাসপাতালে বড় বড় সিলিণ্ডার থেকে পাইপে করে রোগীদের নাকে অক্সিজেন দিতে দেখেছি!
তুই একটা বুদ্ধু, ঐ সিলিণ্ডারে থাকে লিকুইড অক্সিজেন। যাতে অসুস্থ ব্যক্তি সহজেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারে।
আচ্ছা—বলতো আমরা নাক দিয়ে কি নেই?
হাওয়া!
হাওয়া! বাব্বেলে, এটা একটা উত্তর হল? হাওয়াতে তো অনেক রকম পদার্থ আছে, তার মধ্য থেকে আমরা অক্সিজেন নেই, বুঝলি?
এই অক্সিজেনের অভাবে কোন জীব জন্তুই বেঁচে থাকতে পারে না
বন্ধ আলমারিতে এই হাওয়ার অভাব ঘটায় তোর টিড়িয়া অক্কা পেয়েছে।
কেন? আমি তো হাওয়া শুদ্ধুই আলমারি বন্ধ করেছিলুম!
ওফ্, তোর কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়! মা, একটা গ্লাস আর মোমবাতি নিয়ে আয়—ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।
এই নে!
এনেছিস? তাহলে নিঃশ্বাসে আমরা অক্সিজেন টেনে নিই, ছাড়ি—কার্বনডাইঅক্সাইড।
বাতাসে অক্সিজেন আছে বলেই বাতীটা জ্বলতে পারছে। এবার গ্লাসটা দিয়ে বাতিটা ঢাকা দিয়ে দিলুম।
এতে কি পাখিটা বেঁচে উঠবে? কে জানে!

মোমবাতিটা দপ্ দপ্ করছে!
এর ভেতরে অক্সি-জেনের ঘাটতি শুরু হয়েছে—তাই।
যাঃ, নিভে গেল!
মানে গ্লাসটি এখন কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিপূর্ণ।
হ্যারিকেনের আগুনও তো কাঁচ দিয়ে ঢাকা থাকে কই ওটা তো নিভে যায় না।
আমি কিন্তু আবার গিয়ে হ্যারিকেন আনতে পারবো না।
কি মুসকিল! আমি কি তোকে তাই বলেছি? আমি এর বৈজ্ঞানিক দিকটা বোঝাতে চাইছি।
হ্যারিকেনের ওপরে নীচে ফুটো থাকে। এতে দহনের ফলে যে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় তা ওপর দিয়ে বেড়িয়ে যায় তখন নীচ দিয়ে আসা অক্সিজেন সেই শূণ্য স্থান পূরন করে।
এখানে, তোর ঐ বক্স আলমারিতেও বায়ু চলাচলের কোন পথ না থাকায় পাখিটার রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু ঘটেছে।
একটা মরা জিনিকে এত পরিশ্রম করে আবার সেটাকে মরা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।
যা-চ্ছেলে!
তোর ঐ পাখি নিয়ে যা। হঠাৎ মা এসে এ ঘর নোংড়া জিনিস দেখলে আমাকে আস্তে রাখবে না।
তাই নাকি! তবে তো এখন এ সম্বন্ধে তাঁকে বোঝানোর ভার তোরই। টা-টা—

পদার্থের কথা / অজয় চক্রবর্তী

পদার্থের একটি মৌলিক ধর্ম হলো জাড্য। পদার্থ জড়ভরত। তার নিজস্ব কোন উদ্যোগ সামর্থ্য নেই। বাইরে থেকে ঠেলাঠেলি বা টানাটানি না করলে সে নড়ে চড়ে বসতে চায় না। যে বস্তু স্থির—বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে সে বস্তু অনন্তকাল নিশ্চল অবস্থায় থাকে। স্থির বস্তুর এ ধর্মের নাম স্থিতি জাড্য। কিন্তু জাড্য কেবল স্থির বস্তুরই স্বধর্ম নয়—গতিশীল বস্তুরও জড়তা বা জাড্য আছে। স্থির বস্তু যেমন নিজে থেকে সচল হয় না, গতিশীল বস্তুও নিজে থেকে তার গতিবেগের মান এবং গতির অভিমুখ বদলায় না। গতিশীল বস্তুর স্বাভাবিক প্রবণতা হলো সমদ্রুতিতে সরল-রেখা ধরে চলা। ঠেলা না মারলে স্থির জড়বস্তু যেমন চলে না ঠেলা খেয়ে একবার চলতে শুরু করলে ঐ জড়বস্তু আপন উদ্যোগে থামতেও পারে না। প্রসঙ্গত একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা এক ব্যাঙ্কের দারোয়ানকে নিয়ে। হাতে রাইফেল নিয়ে প্রবেশ দ্বারের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাই ছিল তার কাজ। দশ বছর এভাবে অভ্যস্ত হওয়ায় তার স্বভাবটাও অনেকটা জড় বস্তুর মতোই হয়ে পড়েছিল। একবার ঐ ব্যাঙ্কে ডাকাত পড়েছে। ডাকাতরা কয়েক লাখ টাকার বাণ্ডিল নিয়ে তারই নাকের ডগা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তাতেও দারোয়ানজীর কোন বিকার লক্ষ্য করা গেল। ম্যানেজার দৌড়ে এসে ঠেলা মারলেন দারোয়ানকে। বললেন, 'হীরা সিং, ডাকু তো ভেগে যাচ্ছে। ওদের পেছনে ছোটো। ম্যানেজারের কথার ধাক্কায় দারোয়ান ছুটলো ডাকাতদের পেছনে। এক সময় অ্যাথলীট ছিল হীরা সিং। ম্যারাথন রেস-এ প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল সে। সেই সুবাদেই ব্যাঙ্কের চাকুরী। হীরা সিং ম্যানেজারের ঠেলা খেয়ে জড়তা কাটিয়ে ডাকুদের পেছনে ছুটলো দুরন্ত গতিতে। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলো, হীরা সিং-এর মতো দৌড়বীর যখন তাড়া করেছে তখন ডাকুরা ধরা পড়বেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হীরা সিং-এর গতি জাড্যই ডাকু ধরার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দৌড় শুরু করার পর ম্যারাথন বীর হীরা সিং এর আর থামবার ক্ষমতা ছিল না। তাই, ডাকুদের পেছনে ফেলেই সে রণপায়ে এগিয়ে গিয়েছিল—তাঁদের ধরার জন্যও দাঁড়াতে পারে নি। এ গল্পে জড় বস্তুর স্বভাবের এক নিখুঁত উপমা পাই হীরা সিং-এর স্বভাবে।

দৈনন্দিন জীবনের নানান অভিজ্ঞতা থেকেই পদার্থের স্থিতিজাড্য এবং গতিজাড্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তোমার পড়ার ঘরের টেবিলের ওপর বই খাতা, টেবিল ল্যাম্প, দোয়াত—এগুলোকে যেমনভাবে সাজিয়ে রাখো এরা তেমন ভাবেই থাকে। যদি কখনো দেখো যে, তোমার টেবিল থেকে তোমার দোয়াতটা উধাও হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে এর পেছনে অন্য কারো হাত আছে। জড় পদার্থের স্থিতি জাড্য না থাকলে কিন্তু আমাদের খুবই অসুবিধেয় পড়তে হতো। কোন জিনিসকেই তাহলে আর যথাস্থানে খুঁজে পাওয়া যেতো না।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় স্থিতি জাড্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ঘটে না। কিন্তু পদার্থের গতিজাড্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ফুটবলে 'কিক' করলে বলটি গতিশীল হয় বটে, কিন্তু কিছুটা গিয়েই তা থেমে থাকে। এ থেকে মনে হতে পারে যে, কোন বস্তুর উপর বল-প্রয়োগ অব্যাহত না থাকলে বস্তুটি তার গতি বজায় রাখতে পারে না। অনুরূপ ঘটনাবলী লক্ষ্য করেই বোধকরি প্রাচীন কালের দার্শনিকরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, স্থিরাবস্থাই জড় পদার্থের 'স্বাভাবিক অবস্থা'। তাদের ধারণা ছিল এই যে, স্থির বা স্থায়ী বলের ক্রিয়াধীন না হলে কোন বস্তু একই দ্রুতিতে সরলরেখা বরাবর চলতে পারে না। বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রথম এ ধারণার অবসান ঘটান। তিনি এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোন গতিশীল বস্তুর ওপর বাহ্যিক বল ক্রিয়া করলে তবেই বস্তুটির বেগের পরিবর্তন হয়, অন্যথা বস্তুটি সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলতে থাকে। অর্থাৎ, সরলপথে সমদ্রুতিতে চলমান অবস্থাই পদার্থের 'স্বাভাবিক অবস্থা'। প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্যালিলিও এর উক্ত সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় তবে চলন্ত ফুটবল কিছুটা গিয়ে থেমে যায় কেন? এর কারণ হলো এই যে, ফুটবল যখন চলতে থাকে তখন তার গতির বিরুদ্ধে বাধাজনিত বল ক্রিয়া করে। এই বিরুদ্ধ বলই ফুটবলের বেগের হ্রাস ঘটায় এবং শেষ পর্যন্ত ফুটবলটিকে থামিয়ে দেয়। গ্যালিলিও এর উক্ত সিদ্ধান্ত পদার্থবিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। গ্যালিলিও-এর গতি বিষয়ক গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন বিজ্ঞানী নিউটন। তিনি গ্যালিলিও-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে এবং গ্যালিলিও অনুসৃত পথে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গতি-সম্পর্কিত তিনটি সূত্রে উপনীত হন। এই সূত্র তিনটির মধ্যে প্রথম সূত্রটি প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিও প্রদত্ত সূত্র। এ সূত্র অনুসারে বাইরে থেকে বল-প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির অবস্থায় থাকে এবং সচল বস্তু সমদ্রুতিতে সরলরেখা ধরে চলে।

প্রাত্যহিক জীবনের নানান অভিজ্ঞতা থেকেই এই-

সূত্রের যাথার্থ্য বোঝা যায়। ট্রামে বাসে চলাফেরা করার সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, স্থির ট্রাম বা বাস হঠাৎ ছেড়ে দিলে আরোহী বাসের গতির উল্টোদিকে একটা ধাক্কা খায়। আরোহীকে কে ঠেলে দেয়? চলন্ত বাস যখন হঠাৎ ব্রেক কষে থাকে তখন বাসের আরোহীরা সামনের দিকে ঠেলা খায় এবং অসতর্ক থাকলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেই বা বাসের আরোহীদের কে ধাক্কা দেয়? বাসের হঠাৎ চলা এবং হঠাৎ থামার সময় আরোহীদের ওপর এই যে, বল ক্রিয়া করে তা কিন্তু 'বাস্তব বল' নয়। এক্ষেত্রে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে আরোহীদের ঠেলে দিচ্ছে। আরোহীদের অনুভূত এই বলকে 'অলীক বল' বা 'ছদ্ম বল' বলা হয়। পদার্থের জাড্য থেকেই এই বলের উদ্ভব। আসলে, স্থির বাস যখন হঠাৎ চলতে শুরু করে তখন আরোহীদের দেহ স্থিতিজাড্য বশত স্থিরই থাকতে চায়। কাজেই, বাস এগিয়ে গেলেও আরোহীদের দেহ আগের অবস্থাতেই থাকতে চায়। ফলে, আরোহীদের মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য হাতের ঠেলায় বাসের গতির উল্টোদিকে পড়ে যাচ্ছে। আবার, চলন্ত বাস যখন হঠাৎ ব্রেক কষে থামে, আরোহীরা তখনও তাদের দেহের গতিজাড্যের দরুন সচল থাকতে চায়। ফলে বাস থেমে গেলেও আরোহীদের দেহ গতিজাড্য বশতঃ সামনের দিকে যেতে চায়। [ক্রমশঃ]

ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা-9

পড়াশোনা

এক মুহূর্তের যোগ / কমল চক্রবর্তী

আমি তোমাদের এমন একটি যোগ করতে দেব যা করতে তোমাদের কিছু সময় লাগবে। যোগটা যদি বড় আকারে দিই তবে সময় বেশী লাগবে আর ছোট আকারে দিলে তা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তোমাদের এমন উপায় শিখিয়ে দিতে পারি যাতে এই ধরণের যোগ, যত বড়ই হোক না কেন সেটা করতে সময় লাগবে মাত্র 2 থেকে 3 সেকেণ্ড।

একটা যোগ নিচে লেখা হলো। এই যোগ করার আগে প্রতিক্ষেত্রে বিয়োগ করে নিতে হবে এবং বিয়োফলগুলির যোগ করতে হবে। এইভাবে করতে সময় তো কিছু লাগবেই। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজ হবে। ধর তোমাকে একটা সংখ্যা লিখতে বলা হলো। সংখ্যাটি থেকে তোমার ইচ্ছে মত আরেকটা সংখ্যা বিয়োগ করতে বলা হলো। এর পরের বার আরেকটা সংখ্যা এবং এর থেকে প্রথমে যে সংখ্যাটা ধরেছিলে তা বিয়োগ করো। এই ভাবে প্রত্যেকবার যে সংখ্যাই ধরো না কেন, তার আগের বারের সংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে। এইভাবে তুমি বিয়োগের একসারি অংক তৈরী করতে পারো। শুধু সর্ত হলো যা থেকে বিয়োগ করা হচ্ছে, সেটাই পরের বিয়োগের অংকে বিয়োজ্য হিসেবে লিখতে হবে।

যেমন—
$$\begin{aligned} 9-4&=5\\ 16-9&=7\\ 25-16&=9\\ 32-25&=7\\ 39-32&=7\\ 49-39&=10\\ 69-49&=20 \end{aligned}$$

যোগফল = 65

এ এক বিয়োগের যোগ। তোমরা ইচ্ছে করলে আরও বড় বিয়োগের যোগ লিখতে পারো। এখন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিয়োগ করে যে বিয়োগফল পাওয়া গেল, সেগুলি যোগ করে 65 পাওয়া গেল এবং এই কাজ করতে তোমাদের 1 থেকে 2 মিনিট সময় লেগে যাবে।

এখন তোমাদের যে নিয়মটা শিখিয়ে দিচ্ছি তা মেনে চললে দেখবে যে যোগটা করতে 2 থেকে 3 সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগবে না। এরজন্য তোমাকে শেষ বিয়োগের অংকের বাঁদিকের সংখ্যা থেকে প্রথম বিয়োগের অংকের ডানদিকের সংখ্যাটি বিয়োগ করলেই হবে আর তাতেই উত্তর পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে শেষ অংকের বাঁদিকের সংখ্যা = 69 এবং প্রথম অংকের ডানদিকের সংখ্যা = 4 এবং এই দুটি সংখ্যার বিয়োগফল = 65, (69 − 4 = 65)। আর এ কাজটি করতে নিশ্চয়ই 2 থেকে 3 সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগবে না। এখন এর কারণটা বলে দিচ্ছি। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে ঐ দুটো সংখ্যা ছাড়া বাকী সংখ্যাগুলো যোগের সময় কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে, আর তাতে যোগের ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ, কলকাতা।

বৃদ্ধি ও জনন

দিনোজ কুমার দে

প্রঃ 1. জীবের বৃদ্ধির কারণ কি ?

উঃ জীবের বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় উপচিতির হার অপচিতি অপেক্ষা বেশী হলে কোষজ বস্তুগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে কোষগুলি বিভাজিত হয় এবং আয়তনে বাড়ে। আর তখনই জীবের বৃদ্ধি ঘটে।

প্রঃ 2. সদ্য বিভাজিত উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা থাকলেও পরবর্তীকালে স্থূল হয় কি ভাবে ?

উঃ সদ্য বিভাজিত উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীরের উপর ক্রমশ কিউটিন, সুবেরিণ, লিগনিন ও নানা রকম খনিজ পদার্থ জমা হতে থাকে, ফলে কোষপ্রাচীর স্থূল হয়।

প্রঃ 3. প্রাণীদের চুল, নখ এবং শিং এর লম্বায় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি ?

উঃ প্রাণীদের চুলের গোড়ায় ক্যারোটিন জাতীয় পদার্থ এবং নখ ও শিং-এ ক্যালসিয়াম জাতীয় পদার্থ জমা হওয়ায় জন্য এই গুলি লম্বায় বৃদ্ধি পায়।

প্রঃ 8. জীবনচক্রে নিম্ফ (Nymph) দশা দেখা যায় এমন কয়েকটি প্রাণীর নাম কর।

উঃ উইপোকা, গঙ্গাফড়িং, আরশোলা প্রভৃতি প্রাণীর জীবনচক্রে নিম্ফ দশা দেখা যায়।

প্রঃ 5. লার্ভা কি ?

উঃ কতকগুলি প্রাণী ভ্রূণ হতে সরাসরি পূর্ণ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় না। তাদের জীবনচক্রে দ্বাবলম্বী একটি দশা যেটি পূর্ণ প্রাণীর মত দেখতে হয় না, তাকে লার্ভা বলে। মেরুদন্ডী প্রাণী ব্যাঙ এবং অমেরুদন্ডী প্রাণী মশা, প্রজাপতি প্রভৃতির জীবন চক্রে লার্ভা দশা দেখা যায়।

প্রঃ 6. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রস্থবৃদ্ধি ঘটে কেন ?

উঃ দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কান্ডে নালিকা বান্ডিলে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝখানে ক্যামবিয়াম নামে এক প্রকার ভাজক কলা থাকে। এই ক্যামবিয়াম কলার বিভাজন হয় বলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রস্থবৃদ্ধি ঘটে।

প্রঃ 7. ডায়াপজ (Diapause) অবস্থা কি ?

উঃ কতকগুলি পতঙ্গের জীবনচক্রের যে কোন দশায় আলোক সময় (light period) কম হলে ঐ দশাটির আর বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু জীবটি প্রাণে বেঁচে থাকে। তাকে ডায়াপজ অবস্থা বলে।

প্রঃ 8. অযৌন ও যৌন জননের একক কি কি ?

উঃ অযৌন জননের একক রেণু এবং যৌন জননের একক জনন কোষ।

প্রঃ 9. অন্ড জরায়ুজ (ওভোভিভিপেরাস) প্রাণী যাদের বলে ?

উঃ যে সব মেরুদন্ডী প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণু মাতৃগর্ভে অবস্থান করে কিন্তু মাতার দেহ হতে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করে না, তাদের বলাহয় অন্তজরায়ুজ প্রাণী। যেমন—হাঙর।

প্রঃ 10. জরায়ুজ (ভিভিপেরাস) প্রাণী কাদের বলে ?

উঃ যে সকল মেরুদন্ডী প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণু মাতৃগর্ভে অবস্থান করে এবং মাতার রক্ত থেকে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তাদের জরায়ুজ প্রাণী বলে। যেমন—কুকুর (সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী)।

প্রঃ 11. ডিপ্লয়েড অপুংজনি কি ?

উঃ কোনো কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে অপুংজনির দ্বারা ডিপ্লয়েড বা $2n$ প্রাণী উৎপন্ন হয়। এই রকম অপুংজনিকে বলা হয় ডিপ্লয়েড অপুংজনি। ছিটপোকা বা অ্যাফিডের ক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড অপুংজনি দেখা যায়।

প্রঃ 12. হ্যাপ্লয়েড অপুংজনি দেখা যায় কোন্ প্রাণীর ?

উঃ মৌমাছির হ্যাপ্লয়েড অপুংজনি দেখা যায়। রাণী মৌমাছির হ্যাপ্লয়েড অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে পুরুষ মৌমাছির সৃষ্টি হয়।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির চারটি করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে।

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন কর :

(i) **একবীজপত্রী উদ্ভিদের গৌণবৃদ্ধি হয় না কারণ একবীজপত্রী উদ্ভিদের**

(a) নালিকা বান্ডিলের সংখ্যা ছয়ের বেশী।
(b) নালিকা বান্ডিলগুলি অরীয়ভাবে সজ্জিত।
(c) জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মধ্যেখানে প্যারেনকাইমা কোষ থাকে।
(d) ক্যামবিয়াম থাকে না।

(ii) **বৃদ্ধির সিগময়েড বক্ররেখা**

(a) ইংরাজী এম (M) অক্ষরের মতো।
(b) ইংরাজী এস (S) অক্ষরের মতো।
(c) ইংরাজী এন (N) অক্ষরের মতো।
(d) ইংরাজী এক্স (S) অক্ষরের মতো।

(iii) **পরিস্ফুরণ**

(a) কোষ-বিভাজন পদ্ধতি। (b) এনজাইমের

ভাঙ্গন পদ্ধতি। (c) বৃদ্ধির দ্বারা দেহের আকৃতি গঠন পদ্ধতি। (d) বিশেষ ধরণের জনন পদ্ধতি।

(iv) নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি আলোক বিমুখ উদ্ভিদ ?

(a) কচু। (b) সূর্যমুখী। (c) টোম্যাটো।
(d) আগের কোনটিই নয়।

(v) শুক্রাণু সৃষ্টির পদ্ধতিকে বলা হয়

(a) সেপারোজেনেসিস। (b) সপার্মাটোজেনেসি।
(c) উজেনেসিস। (d) পিডোজেনেসিস।

(vi) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে বলা হয়

(a) নিষেক। (b) দ্বি-নিষেক। (c) স্বনিষেক।
(d) পরনিষেক।

(vii) বহিঃনিষেক দেখা যায়

(a) পায়রার। (b) হাতীর। (c) কুমীরের। (d) মাছের।

(viii) নিম্নলিখিত কোন্ প্রাণীটির যৌন ও অযৌন উভয় প্রকার জননই দেখা যায় ?

(a) ব্যাঙ। (b) রুইমাছ। (c) হাইড্রা।
(d) টিকটিকি।

(ix) কুনোব্যাঙের পুংরেচন জননতন্ত্রের অংশ কোন্‌টি ?

(a) ডিম্বাশয়। (b) ডিম্বনালী ছিদ্র (c) ডিম্বনালী।
(d) শুক্রাশয়।

(x) সংশ্লেষ বা কনজুগেশন এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

(a) তারামাছ। (b) প্যারামোসিয়াম। (c) স্যালামান্ডার
(d) ইঁদুর।

পোঃ পাঁইটা বর্দ্ধমান।

অংকে নম্বর বাড়াতে হলে

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অংক বাদে সব বিষয়ের নম্বর উত্তরের ভাল মন্দের উপর বেশী-কম হয়। কিন্তু অংকের ক্ষেত্রে বলা হয় 'নম্বর হয় পুরো নয় জিরো'। অর্থাৎ অংকটি ঠিক করতে পারলে পুরো, আর সামান্যতম ভুল হয়ে গেলেই জিরো। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে অংকেও এক নম্বর কাটা যায়। যেমন সমাধানের 'বা' অথবা 'or' না লিখলে সমাধান ঠিক হলেও এক নম্বর কাটা যায়। তবে মুখে মুখে হিসাব করে ঠিক উত্তর লিখলে নম্বর কাটা যায় না। যেমন $(2a+3b)^2=(2a)^2+2.2a.3b+(3b)^2$ না লিখে $4a^2+12ab+9b^2$ লিখলে ও নম্বর পাওয়া যায়। কিন্তু আন্দাজে বসালে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে হবে। যেমন, অবজেক্‌টিভের ক্ষেত্রে বৃহত্তম রাশির মান চাইলে অনেক ছাত্রছাত্রী মান শব্দটির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বৃহত্তম রাশিটি লিখে দেয়। আবার, প্রশ্নে আছে ঠিক উত্তরে পাশে (√) টিক দাও। এ ক্ষেত্রে ঠিক অংকের পাশে টিক (√) চিহ্ন ও ভুল অংকের (×) ক্রশ চিহ্ন দিলেও ভুল হয়। এতেও নম্বর কাটা যায়। বীজগণিতে উৎপাদক করার সময় রাশিটিকে যতগুলি সম্ভব ভাঙতে হয়। না হলে কোন নম্বর পাওয়া যায় না। যেমন $x^3-6x^2+11x-6x$ এই উৎপাদকটির ক্ষেত্রে $x=1$ বসিয়ে রাশি মালাটির মান শূন্য হয় দেখিয়ে $-x^3-x^2-5x^2+5x+6x-6=x^2(x-1)-5x(x-1)+6(x-1)=(x-1)(x^2-5x+6)$ এই পর্যন্ত করলে কোন নম্বর পাওয়া যায় না। x^2-5x+6 কে আবার বিশ্লেষণ করে $x^2-3x-2x+6=(x-3)(x-2)$ বের করতে হয়। গ সা· গু· ও ল· সা· গু· অংকের ক্ষেত্রে উৎপাদক ঠিক করে কষে শেষে স্পষ্টভাবে গ· সা· গু· বা ল· সা· গু· লিখতে হয়।

সমাধানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হোক উভয় পক্ষকে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে তা লিখে দিতে হয়। পক্ষান্তরে নিয়ম ঠিকভাবে মেনে চলা উচিৎ। $\left(x-a-b\right)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=0$ এক্ষেত্রে যদি লেখা হয় $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$ বা ঐ রাশিটি x বর্জিত বলে এর মান শূন্য হতে পারে না, এর কোনটিই ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে লিখতে হবে ঐ রাশিটির মান শূন্য হলে এটি অভেদ হবে। কিন্তু এটি সমীকরণ। তাই ঐ রাশিটির মান শূন্য হতে পারে না। দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে x এর দুটি মানই বের করতে হবে। একটি বের করলে অর্ধেক।

লেখচিত্রের বেলাতেও সমীকরণ দুটি থেকে ঠিকভাবে কষে তিনটি করে বিন্দুর স্থানাংক বের করতে হয়। দুটি অক্ষ অঙ্কন করে অক্ষের দিকের চিহ্ন দিতে হয়। ঠিক করে বিন্দু বসিয়ে তার পাশে স্থানাঙ্ক লিখতে হয়। এবং বিন্দুগুলি যোগ করে সরলরেখা দুটি টেনে ছেদ বিন্দুর স্থানাংক বের করতে হয়। সব ঠিক হলে এখানে ও পুরো নম্বর পাওয়া যায়।

পাটীগণিতের অংকে লেখা ঠিক হওয়ার উপর নম্বর নির্ভর করে। ঠিক ঠিক একক লেখা প্রয়োজন। সুদ, আসল ইত্যাদি ঠিক করে লেখা উচিৎ। কোন ক্ষেত্রে x বা y ব্যবহার করলে, x ও y এর মানে কি তা লিখে দিতে হয়। সূত্র ব্যবহার করলে সূত্রটি লিখতে হয় এবং অক্ষর দিয়ে সূত্র লিখলে অক্ষর গুলির মানে লিখে দিতে হয়। অনুপাতের অংকে $a:b:c=2:3:4$ এখানে অনুপাতের যোগফল $=2+3+4$ লেখা ঠিক নয়।

1, মনোমোহন বসু স্ট্রীট, কলকাতা-6

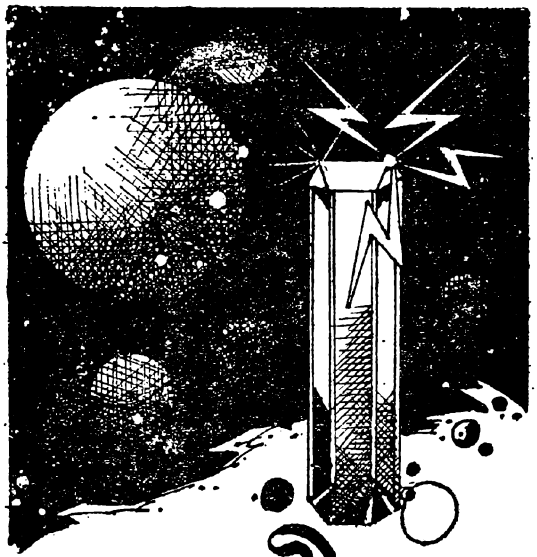

অমলথীয়ার রহস্য.

নিরঞ্জন সিংহ

[নয়]

জীবন্ত সমাধি

রবার্টের পিছনে পিছনে এগুতে লাগল সাদিক। উত্তেজনায় দু'জনের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। দু'জনের মনে একটাই চিন্তা—এগিয়ে গিয়ে না জানি ওরা কিসের মুখোমুখি হবে! সিঁড়িটা বেশ চওড়া। পাশাপাশি অন্তত পাঁচ ছ'জন লোক চলতে পারে। এতক্ষণে ওরা নিঃসন্দেহ। অমলথীয়ায় বুদ্ধিমান জীব আছে—এই তৈরি সিঁড়িই তার মোক্ষম প্রমাণ।

কিছুটা এগোবার পরই সিঁড়ি শেষ হয়ে শুরু হল রাস্তা। রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা সিঁড়ির মাপে চওড়া। আর শক্ত কোন ধাতুতে মোড়া। রবার্ট একটানা টর্চ জেলে রেখেছে। মাথার উপর হাত তিনেক উঁচুতে পাহাড়। জায়গাটা সুড়ঙ্গ মত। নিঃশব্দে দু'জনে এগিয়ে চলেছে। আর কতদূরে যেতে হবে কে জানে? মিঃ চার্লস বা অমলথীয়াবাসী কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। আরো কিছুটা যাওয়ার পর মাথার উপরকার পাহাড় যেন হঠাৎ অদৃশ্য হ'ল। তারপরই ওরা যে দৃশ্যের মুখোমুখি হ'ল তাতে বেশ কিছুক্ষণ বিস্ময়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার দু'পাশে স্ফটিকের তৈরি বাড়ি। সেই বাড়ির উপর টর্চের আলো পড়ে শুরু হয়েছে অদ্ভুত রঙের খেলা। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, একটার পর একটা আলোর ঢেউ যেন বয়ে চলতে শুরু করল। রবার্ট টর্চের আলোটা চারিদিকে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগল। মাথার উপরকার পাহাড়টা উঠে গেছে অনেক উপরে। একটা গোটা পাহাড় কেটে কি অদ্ভুত আস্তানা তৈরি করেছে অমলথীয়াবাসীরা। কিন্তু এখানে আলোর কোন বন্দোবস্তো নেই কেন? ভাবল রবার্ট। এরকম অন্ধকারে কোন জীব বাস করতে পারে? রবার্ট হঠাৎ হাতের টর্চটা নিভিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে এলো না। স্ফটিকের বাড়িগুলোর মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোর খেলা চলল। তারপর খুব আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আলোর রেশটুকু। এবার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার গ্রাস করল ওদের। সাদিক একটু এগিয়ে এসে হাত রাখল রবার্টের কাঁধে। রবার্টও হাত বাড়িয়ে সাদিকের হাতের উপর হাত রাখল। কেউ কোন কথা বলল না। কথা বলতে ওরা যেন ভুলে গেছে। নিঃশব্দে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল। কীসের অপেক্ষা তা ওরা যেন জানে না। হয়তো সুন্দর কিছুর অথবা কিছু ভয়ঙ্করের। সময়ের গতি যেন ধীর লয়ে নেমে এসেছে। সময় চলছে কি চলছে না তা যেন ওরা অনুভব করতে পারছে না।

অনেকক্ষণ বাদে রবার্ট টর্চ জ্বালল। আবার শুরু হ'ল আলোর খেলা। এতক্ষণে ওরা বাড়িগুলো ভাল করে লক্ষ করল। অদ্ভুত চেহারা ওগুলোর। দেখে বাড়ি মনে হলেও পৃথিবীর বা মানুষের তৈরি বাড়ির সঙ্গে বিশেষ কোন মিল নেই। কোনটা গোল, কোনটা চৌকো—না আছে দরজা, না আছে জানলা। কিন্তু কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। মৃত্যুপুরীর মতই স্তব্ধ এই পাতালপুরী। কিন্তু একথা ঠিক যে এই স্ফটিকপুরী কোন বুদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে তৈরি। ওরা দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে হয়তো এইসব কথাই ভাবছিল। অনেকক্ষণ বাদে রবার্ট বলে উঠল, 'সাদিক, এ এক বিরাট আবিষ্কার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা এখনো ঠিক আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'কি কথা?' সাদিক জানতে চাইল।

'বিজ্ঞানীরা কোন গ্রহ বা উপগ্রহে জীবনের উদ্ভব হওয়ার জন্যে যেসব অবস্থার কথা বলে থাকেন অমলথীয়ায় তো সে রকম অবস্থা নেই।' জবাব দিল রবার্ট

'কি অবস্থার কথা বলেন বিজ্ঞানীরা?'

সাদিক।

রবার্ট বলতে শুরু করল, 'আমাদের সূর্যের মত মাঝ বয়সী কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহ যদি এখন কক্ষপথে থাকে যা নক্ষত্রটির খুব কাছেও না আবার খুব দূরেও না তাহলে সেইসব গ্রহে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আবির্ভাব সম্ভব। হ্যাঁ একটা কথা, এইসব গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এমন হতে হবে যাতে তারা তাদের চারপাশে আবহাওয়া মণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে। সংখ্যাতত্ত্ববিদরা হিসেব করে দেখেছেন যে আমাদের ছায়াপথ বা মিল্কীওয়ে গ্যালাক্সীতে এইসব শর্ত পূরণ করতে পারে এরকম নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় চারশো কোটির মত।'

'বাপরে, সে তো বিরাট ব্যাপার ওদের প্রত্যেকেরই যদি একটা বা দুটো করে গ্রহ থাকে তাহলে—।'

সাদিককে কথা শেষ করতে না দিয়েই রবার্ট বলে উঠল, 'না না, এদের সবারই যে গ্রহমণ্ডল থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আমাদের সূর্যের সব থেকে কাছের কুড়িটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র দুটি নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই নক্ষত্র দুটি হচ্ছে ছ আলোকবর্ষ দূরের বার্ণার্ডস্ স্টার ও এগার দশমিক এক আলোক বর্ষ দূরের 61-সিগনী। তার মানে চারশো কোটি নক্ষত্রের মধ্যে চল্লিশ কোটি নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলী থাকার সম্ভাবনা প্রবল।'

'কিন্তু রবার্ট এই সংখ্যাটাও তো বিশাল।' বলল সাদিক।

'আরও একটা কথা আছে। আমাদের সৌরমণ্ডলের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে সূর্যের নটি গ্রহের মধ্যে মাত্র মঙ্গল ও পৃথিবীতে জীবনবিকাশী পরিবেশ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে গড়ে দশটি সৌরমণ্ডলে মাত্র তিনটি গ্রহে জীবনবিকাশী পরিবেশ থাকতে পারে। অর্থাৎ চল্লিশ কোটি গ্রহমণ্ডলী সমন্বিত নক্ষত্রের মধ্যে প্রায় বারো কোটি গ্রহে জীবনবিকাশী পরিবেশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।'

'বারো কোটিও কিন্তু খুব ছোট সংখ্যা নয় রবার্ট।'

'না, তা নয়। তবে আরও একটা কথা আছে সাদিক।'

'আরও কথা—।' বলে হেসে ফেলল সাদিক।

'হ্যাঁ, তা হচ্ছে জীবনবিকাশী পরিবেশ থাকলেই যে প্রত্যেকটা গ্রহে উন্নত জীবন থাকবে তার কোন মানে নেই। মঙ্গল গ্রহে জীবনবিকাশী পরিবেশ রয়েছে অথচ সেখানে কোন জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এর কারণ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এক কোষী প্রাণী থেকে বহু কোষী ও জটিল মস্তিষ্কের অধিকারী উন্নত প্রাণীর উদ্ভব হতে বহু কোটি বছর লেগে যায়। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হতে লেগেছিল দশ কোটি বছর। এইসব বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আমাদের ছায়াপথেই প্রায় ...ই লক্ষ গ্রহে উন্নত জীবের অস্তিত্ব থাকতে ...মল রবার্ট।

'এলিমিনেশান পদ্ধতিতে সংখ্যাটাকে তো বেশ কমিয়ে নিয়ে এলি।' বলল সাদিক।

'কমিয়ে আনলাম বটে তবে আসল সংখ্যাটা কিন্তু কম নয়।' হাসল রবার্ট।

'খুব হেঁয়ালি চালাচ্ছিস।' সাদিক একটু গম্ভীর হল।

'হেঁয়ালি না, এতক্ষণ তো আমরা শুধু আমাদের গ্যালাক্সির হিসেব করলাম। আমাদের গ্যালাক্সির মত কোটি কোটি কি তারও বেশি গ্যালাক্সি নিয়ে তবেই তো ব্রহ্মাণ্ড—তাহলে এবার হিসেব করে দেখ কতগুলো গ্রহে বুদ্ধিমান জীব থাকতে পারে।' রবার্টের কথা শেষ হতে না হতে সাদিক বলে উঠল, 'ঢের হয়েছে, এবার ক্ষ্যামা দাও। এখানে আর ভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই।'

রবার্ট সামনের দিকে এগুতেই সাদিক ওর কাঁধ চেপে ধরল, 'রবার্ট আর এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চল ফিরে যাই।'

'কিন্তু মিঃ চার্লসকে ফেলে রেখে যাব?' বলল রবার্ট।

'কোথায় তিনি?'

'সে কথা আমিও ভাবছি। অথচ ওঁর গোঙানীর শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনেছি।'

'তা তো শুনেছি।'

'এখানে কোন জীবন্ত প্রাণীও তো চোখে পড়ছে না, যে তারা মিঃ চার্লসকে বন্দী করেছে বলে ধরে নেব। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'রবার্ট, জীবন্ত প্রাণী না দেখতে পেলেও একথা ঠিক যে এখানে জীবন্ত ও বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। তা না হলে পাহাড় কেটে এরকম স্ফটিকের শহর কেউ বানাতে পারে না।'

'তাহলে তারা কি কোন গোপন জায়গা থেকে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছে বলতে চাস?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।'

কিন্তু অন্ধকারে ওরা দেখবে কি করে?'

'জানি না, তবে দেখার ব্যাপারটা আমাদের মত নাও হতে পারে।'

'ওরা আমাদের সামনে আসছে না কেন? লুকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য কি?'

'জানি না, তবে মনে হয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এটা।'

'কি করে বুঝলি?' প্রশ্ন করল রবার্ট।

'ধর, আমাদের পৃথিবীতে আমরা যদি অন্য কোন গ্রহবাসী কোন জীবকে প্রথম দেখতে পেতাম, তাহলে কি করতাম?'

রবার্ট সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমরা প্রথমেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতাম। তাদের বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে আমরা বন্ধুত্ব

চাই। আরো চেষ্টা করতাম জানতে যে ওরা কোন গ্রহলোক থেকে এসেছে।'

'তাছাড়া আর কি করতাম?' সাদিক আবার প্রশ্ন করল।

'তাছাড়া?' রবার্ট একটু ভাবল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আর একটা কাজ করতাম, ওরা যাতে আমাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে তা লক্ষ্য রাখতাম।'

'অর্থাৎ', রবার্টের কথা শেষ হতে না হতে বলল সাদিক, 'ওদের অস্ত্রগুলো পারলে আগে কেড়ে নিতাম, ওদের জীবন্ত বন্দী করার চেষ্টা করতাম, অবশ্য সেটা ওদের এবং আমাদের উভয়ের নিরাপত্তার খাতিরে।'

'তুই ঠিকই বলেছিস। ওরাও আমাদের নিরস্ত্র করেছে। মিঃ চার্লসকে জীবন্ত বন্দী করেছে—এবং আমাদেরও জীবন্ত বন্দী করবে। একটু হেসে রবার্ট যোগ করল, এবং হয়তো আমাদের নিরাপত্তার খাতিরে।'

'আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও ওরা চালিয়ে যাচ্ছে।' বলল সাদিক।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। কিন্তু সাদিক, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'কি?'

'অমলথীয়াবাসীরা বুদ্ধিমান জীব হলেও তারা যে আমাদের চিন্তাধারা মত কাজ করবে তার কি নিশ্চয়তা আছে!'

'তা অবশ্য নেই। কিন্তু পরপর ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে অমলথীয়াবাসীরাও আমাদের লজিক মেনে চলছে?'

'তা ঠিক।' বলল রবার্ট। তারপর ওরা ফিরে চলল।

'সাদিক।'

'বল।'

'ওরা সামনে আসছে না কেন!' ওরা তো ভাল করেই জানে যে আমরা নিরস্ত্র, ওদের কোন ক্ষতি করতে পারব না।'

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে এলোনা

'প্রথম কথা আমরা যে নিরস্ত্র সে বিষয়ে ওরা নিঃসন্দেহ নয়, দ্বিতীয় কথা, হয়তো আড়াল থেকে ওরা আমাদের মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। যখন ওরা বুঝবে যে আমরা কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি, তখন হয়তো সামনে আসবে।'

'আমার কিন্তু আর একটা সন্দেহ হচ্ছে?'

'কি সন্দেহ?'

'এরা অদৃশ্য নয় তো?'

'দূর। বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে একথা তুই নিশ্চয় জানিস যে অদৃশ্য হলে ওরা হবে অন্ধ। কোন অন্ধ জীবের পক্ষে পাহাড় কেটে এমন পাতালপুরী গড়ে তোলা কি সম্ভব?'

'পাতালপুরীর এই অন্ধকার আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।'

'সেকথা আমিও ভাবছি, কিন্তু কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না।'

কথা বলতে বলতে ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল। হঠাৎ ওদের চমকে দিয়ে পাতালপুরীতে আলো জ্বলে উঠল। ওরা পিছন ফিরে দাঁড়াল। শুরু হ'ল সেই বিচিত্র রঙের খেলা। ওরা প্রায় সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল। কিন্তু হঠাৎই আবার আলোর উজ্জ্বলতা কমে এল। এবার ওরা কিছুটা ভয় পেলে গেল। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছুলো গর্তের মধ্যে।

হঠাৎ সাদিকের চিৎকারে চমকে উঠল রবার্ট।

'কিরে? কি হ'ল?' 'দড়ি কোথায়?'

যে দড়ি ঝুলিয়ে ওরা গর্তে নেমেছিল সে দড়ি নেই। রবার্ট টর্চের আলো ফেলে দড়িটা খুঁজল। কিন্তু না দড়িটার কোন চিহ্ন নেই।

'পাতালপুরীতে ঢোকাটা ওদের পছন্দ হয় নি বলে মনে হচ্ছে—তাই এই শাস্তির ব্যবস্থা।' একটু হাসল রবার্ট।

'এ্যাডভেঞ্চার বেশ জমে উঠেছে কি বল?'

'সে আর বলতে।' বলে রবার্ট গর্তের মধ্যে ধপ করে বসে পড়ল।

'বসে পড়লি যে? চল তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আঙ্কলরা নিশ্চয় ভাবছেন।'

'কি করব? দড়ি ছাড়া স্পেস-স্যুট পরে এ গর্তের উপরে ওঠা সম্ভব নয় তা কি এখনো বুঝতে পারছিস না?'

'তার মানে?' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সাদিক শিউরে উঠল।

'তার মানে, আমাদের জীবন্ত সমাধি ঘটে গেছে।' বলে উদাসভাবে গর্তের উপরের দিকের আকাশ দেখতে লাগল রবার্ট। [ক্রমশঃ]

নিকটতম নক্ষত্র পরিবার / তীর্থঙ্কর ঘোষ

প্রায় এক শতাব্দী আগেই আবিস্কৃত হয়েছিলো যে সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্র-পরিবার তা হলো দক্ষিণ সেণ্টরাস নক্ষত্রমণ্ডলীর 1ম মাত্রার জুড়ি নক্ষত্র। সম্প্রতি এই নক্ষত্র পরিবার সম্পর্কে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। α সেণ্টরির দুটি তারাকে নিয়ে একটি তিন তারার পরিবার গড়ে উঠেছে। তৃতীয়টি 2°রও বেশি ব্যবধানে থাকলেও আসলে যে সে α সেণ্টরির নক্ষত্র তা জানা গেছে এটির গতিবেগ ও গতি প্রকৃতি নির্ধারণের ফলে। তিনটি তারাই একই বেগে একই দিকে চলে। তৃতীয় সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে এটি অন্য দুটির চেয়ে আমাদের বেশি নিকটতর। কাজেই এখন পর্যন্ত যে সব তারাদের দূরত্ব মাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে এটিকেই পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী বলা যায়। এর নাম 'নিকটতম' বা 'প্রক্সিমা'। এটি α সেণ্টরির চেয়ে আমাদের 3960 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক নিকটতর।

α সেণ্টরি (A ও B)............ ·751
প্রক্সিমা সেণ্টরি ....·762

A ও B তারা দুটি কেবল 3 4 জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক দূরে দূরে অবস্থিত বলে সমগ্র পরিবারের চেহারাটা অদ্ভুত। ইউ[illegible]স এবং সূর্যের মধ্যে যে দূরত্ব A ও B-এর [illegible]কে একটু বেশী। প্রক্সিমা তাদের থেকে 59 [illegible]' দূরে। A ও B তারা দুটি তাদের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রকে ঘিরে একবার পাক দেয় 79 বছরে। কিন্তু প্রক্সিমার এই আবর্তনে 100,000 বছরেরও বেশী সময় লাগে।

ঔজ্জ্বল্য, ভর ও ব্যাসের দিক দিয়ে এই তারা (A) সূর্যের থেকে একটু এগিয়ে কিন্তু B-এর ভর সূর্যের চেয়ে একটু কম। ঔজ্জ্বল্যে সে সূর্যের $\frac{1}{3}$ ভাগ কিন্তু এটির ব্যাস সূর্যের থেকে $\frac{1}{7}$ ভাগ বড়। এটির উপরিভাগের তাপমাত্রা 4,400° সেঃ। কিন্তু প্রক্সিমা আরো শীতল। এটির তাপমাত্রা 3000° সেঃ রঙ লালচে। এটির ব্যাস সূর্যের 14 গুণ কম। ভরের দিক দিয়ে শত শত গুণ বেশী হলেও আকারে সে বৃহস্পতি ও শনির থেকে ছোট। α সেণ্টরির A থেকে B-কে ইউরেনাস থেকে সূর্যের মতো দেখাবে। প্রক্সিমাকে আমরা দেখতে পাব কিন্তু খুব ক্ষীণ তারার মতো। এই তারা থেকে সে যতটা দূরে তা সূর্য ও প্লুটোর দূরত্বের 250 গুণ বেশি।

α সেণ্টরি ত্রয়ীর পর সূর্যের নিকটতম প্রতিবেশী হলো ওফিউকাস নক্ষত্রমণ্ডলীর 9·7ম মাত্রার একটি তারা যা 'উড়ন্ত তারা' বলে পরিচিত। অত্যন্ত দ্রুত আপাতগতির ফলেই এই নামকরণ। α সেণ্টরির তুলনায় সে আমাদের চেয়ে $1\frac{1}{3}$ গুণ দূরে। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের আকাশ থেকে এটিই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সে আরো দশ হাজার বছরেরও কম সময়ে দ্বিগুণ কাছে এসে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী হবে।

3x+6
(x − 3)
সা গ
ষ্টভাবে গ

দূর আকাশের হাতছানি

বিমল বসু

ঠাকুরমার ঝুলির পক্ষিরাজ আর রাজপুত্তুরের গল্প কে না পড়েছে? সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে ঝড়ের বেগে উড়তে উড়তে পক্ষিরাজ বীর রাজপুত্রকে চক্ষের নিমেষে পৌঁছে দেয় নিঝুমপুরীর দেশে। যেখানে রাক্ষসের মায়ায় ঘুমিয়ে আছে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র লোকলস্কর আর ঘুমিয়ে আছে পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা। এই গল্প পড়তে পড়তে কতদিন মনে মনে ভেবেছো, আহা আমিও যদি ওই রাজপুত্র হতাম—পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে যদি যেতে পারতাম সাত সমুদ্র তের নদীর পার!

আসলে পক্ষিরাজ ঘোড়া বলে তো সত্যি সত্যিই কিছু নেই, কোনদিন ছিলও না। ওটা মানুষের কল্পনা। পৃথিবীর নানা দেশের রূপকথার উপকথায় আকাশে ওড়ার এরকম কত যে কল্পনা ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। আরব দেশের উড়ন্ত কার্পেট আর রামায়ণের পুষ্পক রথ তারই উদাহরণ। মানুষ যেদিন থেকে একটু একটু করে আকাশ চিনতে শিখেছে সেদিন থেকেই সে পাখির মতো উড়তে চেয়েছে আকাশে। তাকে পাগল করেছে দূর আকাশের হাতছানি। কিন্তু সেদিন আকাশে ওড়ার কোন উপায় তার জানা ছিল না। একটা কিছু উপায় বের করে নেওয়ার মতন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আর কলাকৌশল সে তখনও অর্জন করতে পারে নি। তাই শুধু কল্পনা করেই মনের সাধ মিটিয়েছে।

মানুষের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন প্রথম সফল হল অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে। 1783 সালে বেলুন উদ্ভাবন করলেন ফরাসী দেশের দুই ভাই জোশেফ এবং জ্যাকুইস মণ্টগল-ফিয়ার। ওই বছরেই দুজন লোক সেই বেলুনে চড়ে আকাশে উঠল। এরপর ক্রমশ আরও উন্নত ধরনের বেলুন তৈরি হতে লাগল। এবং ইউরোপে বেলুনে চড়ে শূন্যে ওড়ার একটা হিড়িক পড়ে গেল। এইসব বেলুন বিশাল বিশাল আকারের হত। খোলটা তৈরি করা হত কাপড় দিয়ে। ভেতরে ভরা থাকত বাতাসের চেয়ে হালকা কোন গ্যাস, সাধারণত গরম বাতাস। পরে তার জায়গায় আরও হালকা জাতের হাইড্রোজেন গ্যাসের চল হয়। তারও অনেক পরে হিলিয়াম। বাতাসের থেকে হালকা গ্যাসে ভর্তি থাকার দরুণ বেলুন বাতাস ভেদ করে আকাশে উঠত। বেলুনের তলায় বড়সড় ঝুড়ির মতন কিছু ঝুলিয়ে দিয়ে তাতেই চড়ে বসত লোক। নামবার সময় একটু একটু করে বেলুনের গ্যাসটা বের করে দেওয়া হত। জুল ভের্ন-এর লেখাতে বেলুন ভ্রমণের নানা বিবরণ পাওয়া যায়।

বেলুনের সবচেয়ে বড় অসুবিধে ছিল তাকে ইচ্ছেমত শূন্যে চালানো যেত না। বাতাসের ধাক্কায় যেদিকে খুশি উড়ে বেড়াত। কিন্তু মানুষ তাতে খুশি হবে কেন? তখন জারমানির এক বিজ্ঞানী ভাবলেন, বেলুনের সঙ্গে যদি স্টিমারের মতো একটা প্রপেলার বা ঘুরন্ত পাখা লাগিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বাতাসের মধ্যেও তাকে ইচ্ছেমত চালানো সম্ভব। স্টিমারের প্রপেলার যেমন জল কেটে কেটে এগিয়ে যায় বেলুনের প্রপেলারও ঠিক তেমনি করে বাতাস কেটে এগিয়ে চলবে। প্রপেলার চালানোর জন্য অবশ্য একটা ইনজিন চাই। তাছাড়া বেলুনের চেহারাটাও এমন হওয়া দরকার যাতে বাতাসের মধ্যে দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। দেখা গেল একটু লম্বাটে ডিম বা চুরুটের মতো আকৃতি হলেই সবচেয়ে ভালো। 1900 সালে ঠিক এই ধরনের বেলুন তৈরি করে ফেললেন জারমান বিজ্ঞানী কাউনট ফারডিনানড ভন জেপেলিন। এই নতুন আকাশ-যানের নাম দেওয়া হল জেপেলিন। জেপেলিনের খোলটা তৈরি করা হত অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে। ভেতরে ভরা থাকত হিলিয়াম গ্যাস। প্রথম মহাযুদ্ধে জারমানি জেপেলিন থেকে ইংলণ্ডের ওপর বোমা ফেলে বেশ ক্ষতি করেছিল।

আকাশযান হিসেবে জেপেলিনও খুব সুবিধাজনক ছিল না। বাতাসে ভাসিয়ে রাখার জন্যে এর খোলটা খুব বড় করে বানাতে হত। এত বড় যে আজকের বোয়িং বিমানও তার কাছে শিশু। আকারে বিশাল এবং অন্যান্য যান্ত্রিক অসুবিধার দরুণ জেপেলিনের গতিবেগও ছিল খুব কম। তাই বায়ু বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন এমন একটা যন্ত্র বানাতে হবে যা ছোটখাট ছিম অথচ উড়বে চমৎকার।

সেই যন্ত্রই উদ্ভাবন করলেন আমেরিকার উইলবার রাইট ও আরভিল রাইট। এঁরা ছিলেন দুই ভাই। সাইকেল তৈরি করা ছিল তাঁদের পেশা। 1903 সালের 17 অক্টোবর উত্তর ক্যারোলিনার কিটি হক নামে একটা জায়গার কাছে ঝড়ো বাতাস বয়ে চলা সমুদ্র তীরে সেই যন্ত্রটিকে প্রথম আকাশে ওড়ালেন। মাত্র 12 সেকেণ্ড সেটা শূন্যে ভেসেছিল। 120 ফুটের বেশি উঁচুতে ওঠেনি। চালিয়েছিলেন অরভিল। সেটাই ছিল পৃথিবীর প্রথম অ্যারোপ্লেন বা উড়োজাহাজ। মানুষের আকাশ জয়ের অভিযান শুরু হল সেই থেকে।

পাখির মতো দুই ডানাওয়ালা উড়ন যন্ত্রের কল্পনা কিন্তু এরও বহু আগেই করা হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রখ্যাত ইতালীয় শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক লিওনারদো দ্য ভিনসি উড়োজাহাজের প্রায় নিখুঁত পরিকল্পনা করেন। যন্ত্রটির নাম দেন অরনিথপটার। দ্য ভিনসি অবশ্য ওই যন্ত্র বানাতে পারেন নি-কিন্তু ছবি এঁকে তার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সেই ছবির সঙ্গে এখনকার উড়োজাহাজের অনেক মিল। তবে দ্য ভিনসির অ্যারোপ্লেনে ডানা দুটো নাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল।

দ্য ভিনসির অনেক পরে ঊনবিংশ শতকে জারমানির একজন ইনজিনিয়ার অটো লিলিয়েনথাল দেহের দুপাশে মস্ত মস্ত দুটো কৃত্রিম ডানা লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা করেন। এবং সেভাবে উড়তে উড়তেই একদিন পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। লিলিয়েনলালের তৈরি ডানায় ভর করে শূন্যে কিছুক্ষণ ভেসে বেড়ানো যেত। তাই এর নাম গ্লাইডার। খেলাধুলোর জগতে এরকম গ্লাইডারের প্রচলন আজও আছে।

অ্যারোপ্লেন আবিষ্কারের পর উড়ন্ত যান হিসাবে বেলুন গ্লাইডার সবই বাতিল হয়ে গেল। গোড়ার দিকে অবশ্য রাইট ভাইদের আবিষ্কারকে কেউ তেমন আমল দেয় নি। অনেকেই বুজরুকি বলে মনে করেছিল। কিন্তু ওঁরা যখন ইংলণ্ডে গিয়ে বেশ কয়েকটি ওড়ার মহড়া দিলেন তখন থেকেই লোকের মনে বিশ্বাস জাগল। 1908 সাল নাগাদ রাইটদের তৈরি উড়োজাহাজ ঘণ্টায় 40 মাইল বেগে 100 মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পেরেছিল।

এর পরেই 1914 সালে প্রথম মহাযুদ্ধের চাপে অ্যারোপ্লেনের হু-হু করে উন্নতি হয়। নতুন নতুন ধরনের সব উড়োজাহাজ বেরতে থাকে। একেবারে হাল আমলের অ্যারোপ্লেন দেখা দেয় 1939-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে। আর এখন যে কত রকমের কত দারুণ দারুণ সব অ্যারোপ্লেন বেরিয়ে গেছে তা বলে শেষ করা যায় না।

উড়োজাহাজের ওড়াউড়ি বা কেরামতি সবই বাতাসের মধ্যে। বাতাসের সাহায্য ছাড়া পাখি যেমন উড়তে পারে না, উড়োজাহাজও তাই। পাখি ডানা নেড়ে নেড়ে বাতাসে যে ধাক্কার সৃষ্টি করে তারই উলটো ধাক্কায় সে উড়ে চলে শূন্য পথে। উড়োজাহাজের ডানা অবশ্য নড়ে না, ওটা শুধু বাতাসে ভেসে থাকার জন্য।

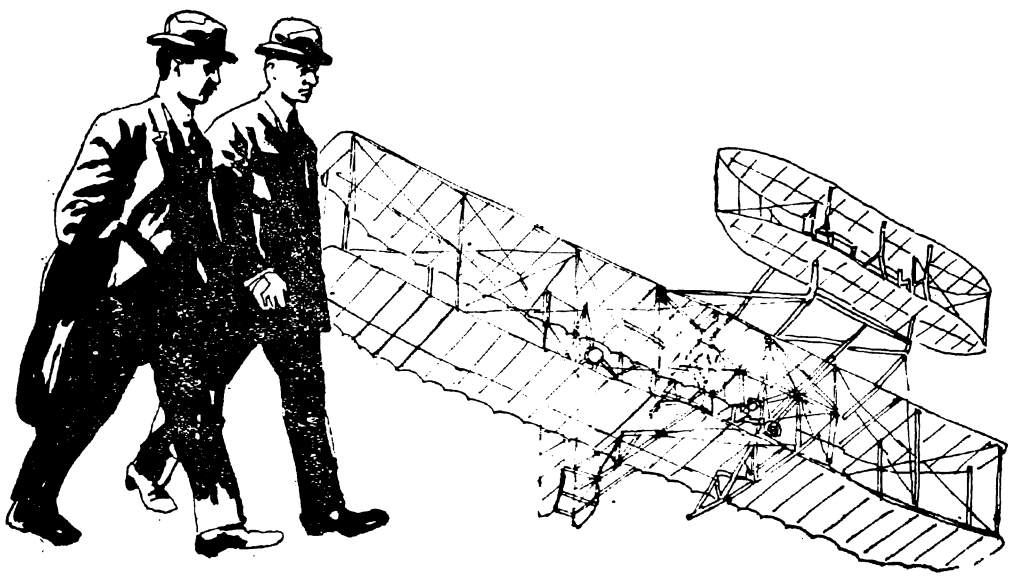

আমেরিকার উইলবার রাইট ও আরভিল রাইট।

বাতাসের সীমানা আর কতদূর? বড় জোর 100 মাইল। তারপরেও বাতাস আছে ঠিকই, কিন্তু এত পাতলা যে অ্যারোপ্লেনের পক্ষে ভেসে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছেটা তো আর বায়ুমণ্ডলের সীমানার মধ্যে আটকে থাকে না। তার মন পাড়ি দেয় বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে দূরে—অনেক দূরে। বায়ুহীন গভীর মহাশূন্যে সে ভেসে পড়তে চায়।

যেদিন থেকে মানুষ জানতে পারল যে, চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সবই এক একটি জ্যোতিষ্ক এবং চাঁদ ও গ্রহগুলি পৃথিবীর মতোই কঠিন বস্তু সেদিন থেকেই গ্রহে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে জাগল তার মনে। খৃষ্ট জন্মের বেশ কয়েক শো বছর আগে গ্রীক দার্শনিকরাই প্রথম অনুমান করেছিলেন যে, পৃথিবী একটি অতিকায় গোলক এবং সূর্য চন্দ্র ও গ্রহগুলি সম্ভবত পৃথিবীর মতোই এক একটি জগত। তারও আগে ব্যাবিলন ও মিশরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির গতি সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেও ওগুলো যে জ্যোতিষ্ক সেটা তাঁদের জানা ছিল না। তাঁরা মনে করতেন ওইসব আলোর জগতের দেবতা আর দানবদের বাস।

গ্রহ নক্ষত্র ও মহাকাশ সম্বন্ধে গ্রীকদের অনেক ভুল ধারণাও অবশ্য ছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী আছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা ইত্যাদি সমস্ত জ্যোতিষ্ক পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তন করে চলেছে। খৃস্ট-জন্মের প্রায় 270 বছর আগে অ্যারিসটারকাস নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বললেন, না, সূর্যই রয়েছে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর পৃথিবী সহ যাবতীয় জ্যোতিষ্ক ঘুরপাক খাচ্ছে সূর্যের চারদিকে।

অ্যারিসটারকাসের এই মতবাদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকল না। এর একশো বছরের মধ্যেই প্রথমে হিপারকাস এবং পরে টলেমির চেষ্টায় পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণাটিই জাঁকিয়ে বসল। টলেমি ছিলেন গ্রীস দেশের লোক, কিন্তু থাকতেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়। আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। ওই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তখন পৃথিবীজোড়া নাম। খৃস্টপূর্ব 150 সাল নাগাদ টলেমির 'আলমাজেসট' নামে একটি বই বেরয়। সেই বইয়ের মাধ্যমেই সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে—এই মতবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে যায়। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে এর জের চলেছিল। লোকের মনেও সেই বিশ্বাস গেঁথে বসে গিয়েছিল। তারপর এই ভুল ধারণার মূলে আঘাত করলেন পোল্যানডের একজন অসাধারণ জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী। তাঁর নাম নিকোলাস কোপারনিকাস। তখনও দূরবীণ আবিষ্কার হয়নি। বছরের পর বছর শুধু খালি চোখেই পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কোপারনিকাস একেবারে অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিলেন যে, সূর্যই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থান করছে আর পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে বৃত্তাকার পথে। কোপারনিকাস বললেন, পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপরেও আবর্তন করে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। তাই দিন রাত্রি হয়। আর সূর্যকে একবার পাক দিয়ে আসে মোটামুটি 365 দিনে। তাই 365 দিনে হয় এক বছর।

'ডি রেভোলুসানিবাস' নামে একখানি বইতে কোপারনিকাস তাঁর সমস্ত আবিষ্কারের কথা লিখে যান। বইটি প্রকাশিত হয় 1543 সালে। ছাপা হয়ে বইটি যখন প্রথম কোপারনিকাসের হাতে পৌঁছয় তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। পৃথিবীতে যে কটি বই ছাপা হয়েছিল ডি রেভোলুসানিবাস তাদের অন্যতম। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব নিয়ে এসেছিল এই বইখানি।

কোপারনিকাসের আবিষ্কারেও কিছু কিছু ভুল ছিল। প্রায় একশো বছরে পরে জারমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলার সেটা ঠিক করলেন। কেপলার প্রমাণ করলেন, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষ-পথ বৃত্তাকার নয়, বরং ডিমের মতো অর্থাৎ উপবৃত্তাকার। এ ছাড়া গ্রহদের গতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তিনি আবিষ্কার করলেন। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের গণনার কাজে আজও এইসব তথ্য খুবই দরকারী।

কোপারনিকাস তাঁর আবিষ্কারের প্রচার দেখে যেতে পারেন নি। এই প্রচার প্রথম শুরু হয় ইটালীতে। জিওরদানো ব্রুনো নামে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী নানা জায়গায় বক্তৃতা করে কোপারনিকাসের মতবাদ ছড়াতে থাকেন। রোমান গীর্জার শাসকরা টলেমির পৃথিবী কেন্দ্রিক তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন বলে ব্রুনো তাঁদের কোপে পড়ে যান। ধর্মবিরোধী মত প্রচারের অপরাধে ব্রুনোকে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

এরপর কোপারনিকাসের তত্ত্বকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করেন প্রখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যেলিলি। নিজের তৈরি দূরবীণে চোখ রেখে গ্যালিলিও দেখতে পেলেন চাঁদের পাহাড়, উপত্যকা আর অসংখ্য জ্বালামুখ। চাঁদ যে সত্যিসত্যিই পৃথিবীর মতো একটি কঠিন বস্তু সেটা হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেল। অতিকায় বৃহস্পতি গ্রহের দিকে দূরবীণ ঘুরিয়ে গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন তার চারটি উপগ্রহ। উপগ্রহগুলি যে বৃহস্পতির চারিদিকে ঘোরে তাও প্রমাণ করে দিলেন। সুতরাং আকাশের সব জ্যোতিষ্কই পৃথিবীকে ঘিরে ঘোরে এই পুরনো ধারনাটা আর টিঁকল না। এরপরই কোপারনিকাসের তত্ত্ব প্রচার করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন গ্যালিলিও। ফলে রোমান গীর্জার ডাক পড়ল। বিচার হল। এবং গ্যালি

করতে হল যে তিনি যা বলেছেন ভুল বলেছেন। টলেমির তত্ত্বটাই ঠিক।

মুখে কবুল করলেও মৃত্যুর দিন পর্যন্ত গ্যালিলিওর মনের বিশ্বাস টলেনি। কারণ পৃথিবী এবং গ্রহগুলিই যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এতে তাঁর সন্দেহই ছিল না। যা সত্য তাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে যায়। কোপারনিকাসের তত্ত্বও ধীরে ধীরে সবাই স্বীকার করে নিল। এরপর মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন এসে জ্যোতির্বিজ্ঞান আর পদার্থবিদ্যাকে একেবারে আধুনিক যুগে পেঁাছে দিলেন।

1642 সালে গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়। আর সে বছরেই নিউটনের জন্ম। নিউটন আবিষ্কার করেন মহাকর্ষ এবং বস্তুর গতি সম্পর্কে তিনটি তত্ত্ব। এই আবিষ্কার মহাকাশ বিজ্ঞান, বিশেষ করে মহাকাশ অভিযানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কেপলারের এই গতি তত্ত্ব খুব দরকারী। মহাকাশযানকে পৃথিবী ছেড়ে অনেক দূরে যেতে হলে পৃথিবীর অভিকর্ষের টান ছিঁড়তেই হবে এবং তাঁর জন্যে মহাকাশযানের রকেট ছুঁড়তে হবে বিশেষ একটি গতিবেগে—এ সবই জানা গেছে কেপলার আর নিউটনের আবিষ্কারের মাধ্যমে। এক কথায়, কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও আর নিউটন—বিজ্ঞানের এই চার মহারথীর অবদান ছাড়া আজকের দিনের চমকপ্রদ মহাকাশ অভিযানগুলি কখনই সম্ভব হত না।

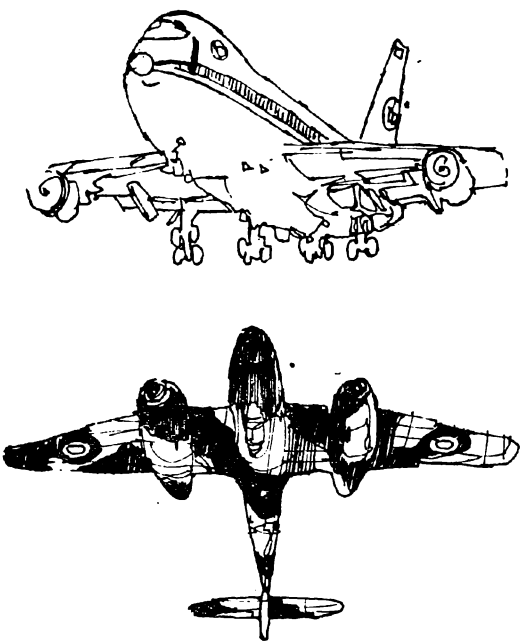

আধুনিককালের আকাশ যান

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যত নতুন নতুন আবিষ্কার হতে লাগল, মানুষের মহাকাশে পাড়ি দেবার ইচ্ছেটাও বাড়তে লাগল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু অভিকর্ষের বাঁধন ছেঁড়ার মতো রকেট তখনও উদ্ভাবিত হয় নি।

চন্দ্র অভিযানের প্রথম গল্পটি অবশ্য বেরিয়েছিল তারও বহু দিন আগে—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। লেখক গ্রীস দেশের সামোসাটাবাসী লুসিয়ান।

লুসিয়ান 'ইকারামেগাস' নামে আরেকটি চন্দ্র অভিযানের কাহিনীও লিখেছিলেন, তাতে ইকারাস নামে একটি লোক দেহের সঙ্গে পাখির ডানা লাগিয়ে নিয়ে চাঁদে পেঁাছেছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলারও কাল্পনিক চন্দ্র অভিযান নিয়ে একটি বই লেখেন। বইটির নাম 'সোমনিয়াম'। এই কাহিনীর নায়ক স্বপ্নযোগে চাঁদে হাজির হন এবং সেখানে বিচিত্র সব জীবদের দেখতে পান। গল্পটা আজগুবি হলেও কেপলার কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য এতে দিয়েছিলেন। যেমন, কেপলার বলেছিলেন যে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত একটানা বায়ুমণ্ডল নেই। কেপলারের পর গডউইন নামে একজন ধর্মযাজক যে চন্দ্র অভিযানের কাহিনী লেখেন তাতে পৃথিবী ও চাঁদে দেহের ওজনের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করা হয়। অথচ অভিকর্ষ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মহাকাশ অভিযানের প্রায় সমস্ত কাহিনীই একেবারে আজগুবি ছিল। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ধারে কাছেও যেত না। ঊনবিংশ শতকে প্রথম সত্যিকার বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প লিখলেন অমর বিজ্ঞান কাহিনীকার জুল ভের্ন। 1865 সালে বেরল তাঁর অসাধারণ উপন্যাস 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন'। কেমন করে তিনটি লোক অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বিশাল এক মহাকাশযানে চড়ে চাঁদের কক্ষে পেঁাছেছিল তারপর চাঁদকে একবার চক্কর দিয়ে ফিয়ে এসেছিলেন পৃথিবীতে তারই চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে এই বইতে। মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল অতিকায় প্রচণ্ড শক্তিশালী এক কামানের সাহায্যে। ফলে প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর অভিকর্ষ কাটিয়ে সেটি চাঁদের কক্ষে হাজির হতে পেরেছিল। যদিও সবটাই কাল্পনিক তবু এই অভিযানের প্রতিটি ধাপ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে ভরা।

মজার কথা হল, আমেরিকার যে জায়গাটি থেকে জুল ভের্নের কল্পিত মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়, সেখান থেকেই অ্যাপলো-11 তিন মার্কিন মহাকাশচারীকে নিয়ে সত্যি সত্যিই একদিন পাড়ি দেয় চাঁদের পথে। কিন্তু গল্পের কথাটি ফলতে সময় লাগে দীর্ঘ একশো চার বছর।

রেডিও গলি, দমদম, কলকাতা-28।

জৈব যৌগ সম্পর্কে কতটা জান ?

বিবেক রায়

1. নিচের কোন্‌টি জৈব পদার্থ নয় ?

(ক) বার্লি (খ) মাখন (গ) খাদ্য লবণ

উঃ খাদ্য লবণ

2. নিচের উক্তিটির ভুলগুলি সংশোধন কর ঃ

"1828 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ল্যাভয়াসিয়ে প্রথম অজৈব খনিজ পদার্থ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে উত্তপ্ত করে 'ইউরিয়া' নামক জৈব যৌগ প্রস্তুত করেন।"

উঃ ল্যাভয়াসিয়ের স্থলে হবে 'ভোল্‌হার', এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের স্থলে হবে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট।

3. স্তন্যপায়ী প্রাণীর মূত্রের মধ্যে কোন্‌ যৌগটি পাওয়া যায় ?

উঃ ইউরিয়া।

4. শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূরণ কর ঃ

"যাবতীয় জৈব যৌগেই—বর্তমান।

উঃ কার্বন।

5. নিচের কোন্‌টি জৈব যৌগ ?

(ক) কার্বন ডাই অক্সাইড (খ) অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট (গ) মরিচা

উঃ অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট

6. 'মিথেন' যৌগে কটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(ক) 2টি (খ) 3টি (গ) 4টি

উঃ 4টি।

7. জৈব যৌগে কার্বন পরমাণুর যোজ্যতা কতো ?

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার।

উঃ চার।

8. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

"অ্যারোমেটিক এবং অ্যালিসাইক্লিক উভয় শ্রেণীকে একত্রে —যৌগ বলে।"

উঃ কার্বোসাইক্লিক।

9. ন্যাপথ্যালিন নিচের কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত যৌগ ?

(ক) অ্যালিফ্যাটিক (খ) অ্যারোমেটিক

উঃ অ্যারোমেটিক

10. যে সব হাইড্রোকার্বন যৌগে দু'টি কার্বন পরমাণুর মধ্যে দ্বিবন্ধ বা ত্রিবন্ধ থাকে তাদের সাধারণভাবে কি নামে অভিহিত করা হয় ?

উঃ অসংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন।

11. কার্বন পরমাণুর নিজেদের যোজ্যতার সাহায্যে পরস্পর যুক্ত হয়ে কার্বন শৃংখল গঠন করবার বিশেষ ক্ষমতার নাম কি ?

উঃ ক্যাটেনেশন।

12. নিচের কোন হাইড্রোকার্বন যৌগে কার্বন পরমাণুর মধ্যে একটি ত্রিবন্ধ বর্তমান ?

(ক) মিথেন (খ) ইথিলীন (গ) অ্যাসিটিলিন।

উঃ অ্যাসিটিলিন।

13. কোনটি ঠিক ?

"সংপৃক্ত জৈব যৌগ (ক) সুস্থিত (খ) দুঃস্থিত হয়।"

উঃ সুস্থিত।

14. নিচে একটি জৈব যৌগের গঠন সংকেত দেওয়া হলো। যৌগটির নাম কি ?

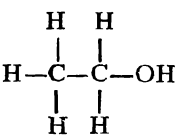

উঃ ইথাইল অ্যালকোহল।

পোঃ ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

ইউনেস্‌কো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
অমরনাথ রায় প্রণীত
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সংখ্যা নিয়ে খেলা ৮
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● 86/1মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

আজকাল কলম বলতে সবাই প্রায় ডট্-পেন বুঝি। ছেলে ছোকরা জোয়ান বুড়ো সবার হাতে ডট্-পেন। গোটা টাকায় চক্‌চকে ডট্ কিনছে, দুদিন লিখছে, রিফিল ফুরোতে না ফুরোতেই ছুঁড়ে দিচ্ছে বাইরে। আর কত রকমেরই বা ডট্-পেন, কত তার বাহার রঙচঙ। একই পেনের একদিকে কালো, একদিকে লাল, কখনও একই মুখে চার চারটি রঙিন রিফিল। দেখতে মনোহারী, ছিমছাম এই ডট্গুলো আমাদের মন কেড়ে নিয়েছে সত্যিই।

ডট্ ব্যবহার করতে করতে আমরা যেন কালি ভরা কলমের কথা ভুলেই গেছি। অথচ এই ডট্-পেন কিন্তু বাজারে খুব বেশি দিন আসেনি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই বিদেশে ডট্-পেন উঠেছে, পঞ্চাশের দশকের দিকে আমাদের দেশে এসেছে। অবশ্য আজকাল আমরা যতই একে ডট্-পেন বলি, আসলে এর নাম 'বল-পেন'; বিদেশে এ সব কলমকে বল-পেন নামেই সবাই চেনে। আমরা কখনও কখনও বল-পেন বলি।

ফাউন্টেন পেন পুরনো হলেও তার কতগুলি অসুবিধা আছে। ভালো কলম না হলে আঙুলে কালি লাগে, পেন ঘষে, কলমের নিব ভালো হতে হবে। নিখুঁত ফাউন্টেন তৈরি করা তাই সব সময় সমস্যা। বয়স্ক লোকেদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমাদের দেশের বাজারে 'জাপানী পাইলট' কলম ছড়িয়ে পড়েছিল— এ কলমের খুব কদর ছিল। অতো সস্তায় আগে ভালো কলম তখনকার দিনে ইংরেজরা দিতে পারত না।

ফাউন্টেন পেন নিয়ে এসব সমস্যার জন্য কারিগররা অনেকদিন ধরে সহজে কলম তৈরি করার চেষ্টা করছিল। 1938 খ্রীস্টাব্দে দুই হাঙ্গেরীয় ভাই—লাস্‌জ্‌লো বিরো ও জিওগ বিরো এই বল-পেনের পেটেন্ট নেয়। বিরো ভায়েরা অবশ্য কলমের ব্যবসায়ী ছিল না। লাস্‌জ্‌লো ছবি আঁকত, মূর্তি গড়ত, খবরের কাগজে লেখালেখি করত, আর জিওর্গ ছিল রসায়নের ছাত্র। হয়ত লেখালেখির কথা ভেবে, রসায়নবিদ ভাই-এর সাহায্য নিয়ে (রসায়নবিদ্ কালি তৈরি করে দেয়) লাস্‌জ্‌লো-এর মাথায় বল-পেনের পরিকল্পনা এসেছিল। যুদ্ধ শুরু হতে ইউরোপে ভারী গোলমাল দেখা দিল, সেজন্য বিরোরা নিরিবিলিতে ব্যবসা করার বলে আর্জেন্টিনায় চলে এল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে ব্রিটেনের 'বিরো-পেন'-এর চলন শুরু হয়, তবে জনপ্রিয় করার মূলে আমেরিকান সৈন্যরা। আমেরিকান সেনা বিভাগের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল সে সময় এমন একটা কলম খুঁজছিলেন যা বৈজ্ঞানিকরা ব্যবহার করতে পারে। সাধারণ কালি ভরা কলমে কাজ করতে অসুবিধা হত, উড়ন্ত বিমানে সে কলম থেকে কালি লিক্ করত।

বিরো-পেন পেতেই আমেরিকানরা লুফে নিল। আমেরিকান তো, যে কোন নতুন জিনিসকে গ্রহণ করতে তাদের দ্বিধা নেই। সেই থেকে বিরো-পেন বা ডট-পেন বা বল-পেন আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল।

বল-পেনের দুটি বৈশিষ্ট্য, এর কালি এবং নিব। সাধারণ কালির কলমের মত নিব নয় বল পেনের। সাধারণতঃ একটি লম্বা পলিথিনের টিউব বা ধাতুর টিউবের মধ্যে ঘন আঠালো কালি ভরা থাকে, টিউবের এক প্রান্তে ধাতুর তৈরি ছোট্ট নিব থাকে। ওই নিবের শেষে একটি খুবই ছোট মাপের ধাতুর বল বসানো থাকে।

লেখার জন্য যখন নিব কাগজের উপর চাপ দেয় তখন ছোট্ট বলটা সামান্য পরিমাণে ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং নিব ও বলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে কালি বেরিয়ে আসে। কালি বেরিয়ে কাগজে আঁচড় কাটে এভাবে বের হবার পদ্ধতিকে কৈশিক পদ্ধতি (capilary action) বলে। ব্লটিং কাগজের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে যেভাবে কালি চুঁইয়ে চলে, ঠিক সেইভাবে বল-পেনের কালি বলের ফাঁক দিয়ে বের হয়।

যখন লেখা হয় না, বল নিবের মুখ আটকে থাকে, ঘন কালি বের হতে পারে না। যত ছোট ও মসৃণ হবে এই বল তত সরু ও নিখুঁত লেখা পড়বে। বলটা কালি মেখে

কাগজের উপর চলাচল করে রেখার আঁচড় ফুটিয়ে তোলে। তবে বল-পেনের কালি তো আর সাধারণ কলমের কালি নয়। কলমের কালি পাতলা, সে কালি যদি বল-পেনে ভরা হয় তবে আর তার নিম্নগামী প্রবাহকে বল ঠেকাতে পারবে না। অবিরাম কালির স্রোত নিচের দিকে বইতে থাকবে।

তাই বল-পেনের কালি ঘন, তার স্বাভাবিক প্রবাহ নেই। প্রথম দিকে সাধারণ ছাপার কালি ব্যবহার করা হত। কিন্তু এ কালি যথেষ্ট ঘন নয়, অকারণে নিব বেয়ে বেরিয়ে আসত। অনেক গবেষণা করে শেষে বল-পেনের জন্য নিজস্ব কালি তৈরি করা হয়। উপযুক্ত জৈব রঙকে ঘন ও ও সান্দ্র তেলের মধ্যে গোলা হয়। কালি এত ঘন হয় যে তার নিজস্ব তারল্য থাকে না, একেবারে চট্‌চটে। লেখার পর ঐ কালিকে কাগজ শোষণ করার পর লেখাটা স্থায়ী হয়। সাধারণ কলমের কালিতে স্পিরিট থাকে, ঐ স্পিরিট উবে যাওয়াতে কলমের কালি শুকিয়ে যায় এবং কালির মধ্যে যে ফেরাস লবণ থাকে তা বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা ফেরিক লবণে জারিত হয়। ফেরিক লবণ লেখার রঙকে গাঢ় ও স্থায়ী করে।

বল-পেনের ব্যাপক প্রচলন হলেও কালির কলম একেবারে উঠে যায়নি। বল পেনে লেখার একটা ত্রুটি আছে। বল-পেনের লেখাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে রেখাগুলি ছিঁড়ে ছিড়ে গেছে, কালির নিব যেরকম নিরবচ্ছিন্ন রেখা টানতে পারে, বল পেন সেরকম পারে না। তাই দলিল বা মূল্যবাণ কোন কাজে বল পেন ব্যবহার করা যায় না, সেক্ষেত্রে কালির কলমেই লিখতে হবে।

যাই হোক, বল-পেনের বাজার এখন বাড়তির দিকে। রোজই নতুন নতুন মডেলের বল-পেন বাজারে আসছে এবং বাজিমাৎ করছে। এই চলবে—যতদিন না নতুন কোন কলম এসে তাকে বাজার থেকে হটিয়ে দিচ্ছে।

রসায়ন বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কল-9।

পরিচিত গাছপালা

কালমেঘ / সন্দীপ সেন

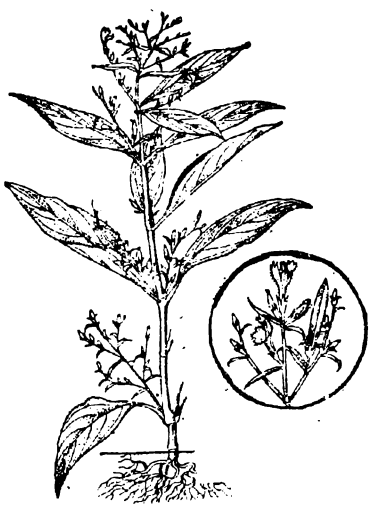

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কালমেঘ একটি সুপরিচিত নাম। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভেষজ ঔষধ হিসেবে ভারতবর্ষে এর প্রচলন আছে। কালমেঘ বীরুৎ জাতীয় বর্ষজীবী গাছ। ভারতবর্ষের সমতলভূমি অঞ্চলের সর্বত্রই এই গাছটি জন্মায়। গাছটি সোজা এবং শাখা প্রশাখা যুক্ত হয়ে ছোট ঝোপ-এর মতো সৃষ্টি করে। গাছটির কাণ্ড এবং শাখা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হয়। পাতাগুলি ছোট ছোট এবং বল্লমের ফলার মতো বা ভল্লাকার। ফুলগুলি ছোট ছোট, হাল্কা বেগুনী আভা যুক্ত এবং গুচ্ছাকারে থাকে।

মূলছাড়া কালমেঘের সমস্ত অংশই ঔষধিগুণ সম্পন্ন। স্বাদে তেতো কালমেঘ একটি বলকারী ঔষধ। কালমেঘের রস রক্ত পরিষ্কারক। জ্বর, কৃমি, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বায়ুরোগে কালমেঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। কালমেঘ পাতার রস মধু দিয়ে খেলে শিশুদের স্বাস্থ্য ভাল করে। বিশেষত যকৃৎ এর অসুখ হয় না। ন্যাবাতে কালমেঘ খুব উপকারী। কুষ্ঠরোগে কালমেঘের পাতা বেটে প্রলেপ দিলে এবং পাতার রস সেবনে উপকার পাওয়া যায়। চুলকানী এবং পাঁচড়াতে সরষের তেলের সঙ্গে কালমেঘের রস মিশিয়ে মাখলে চর্মরোগ ভাল হয়। অনেকের বিশ্বাস সর্পদংশনেও কালমেঘের রস সেবন সর্পদংশিত ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

1/1 বারোয়ারীতলা রোড, কলকাতা-10

ভ্যান হেলমণ্ট

আরো নাম 'জোহান ব্যাপটিস্টা ভ্যান হেলমণ্ট'। ইয়াত্রো রাসায়নিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেলজিয়াম রসায়নবিদ ছিলেন ইনি। 1577 খ্রীষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌স এর এ ধনী পরিবারে ভ্যান হেলমণ্টের জন্ম হয়। লুভ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ ক'রে সেখান থেকেই তিনি এম ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেই সঙ্গে চালিয়ে যান শ্রমসাধ্য রাসায়নিক গবেষণা। চিকিৎসক হলেও রসায়ন বিজ্ঞানকে খুব ভালবাসতো হেলমণ্ট। তাই বহু বছর ধরে দিনরাত রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি দিন কাটিয়েছেন।

রসায়ন বিজ্ঞানে ভ্যান হেলমণ্টের প্রধান কৃতিত্ব হলো গ্যাসের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা। তাঁর আগেকার সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা একমাত্র বাতাসকেই গ্যাসীয় পদার্থ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু হেলমণ্ট প্রমাণ করেন যে, বাতাস ছাড়া আরও অনেক গ্যাসীয় পদার্থ আছে জগতে। 'গ্যাস' কথাটির প্রবর্তকও তিনি। কিন্তু ব্যাপকভাবে 'গ্যাস' শব্দটিকে ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে। তখনকার দিনে গ্যাসকে সংগ্রহ করার উপায় জানা ছিল না বলে হেলমণ্ট বিভিন্ন গ্যাসের ধর্ম নির্ধারণের পরীক্ষা চালাতে পারেন নি।

ভ্যান হেলমণ্ট যে সব রাসায়নিক পরীক্ষা ক'রে গেছেন, তার অধিকাংশই (quantitative)। অধিকাংশ গবেষণাতেই তিনি তুলাদণ্ড ব্যবহার করেছিলেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, কোন ধাতুকে অ্যাসিডে দ্রবীভূত করলে ধাতুটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না। বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে দ্রবণ থেকে ঐ ধাতুকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। 'হেলমণ্ট' কপার সালফেট ও ফেরাস সালফেটের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, কপার সালফেটকে পতিত করলে তা থেকে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় না। অনুরূপ অবস্থায়, ফেরাস সালফেট থেকে কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। এ ভিন্ন হেলমণ্ট নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি খনিজ অ্যাসিড উৎপাদনের একাধিক পদ্ধতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। হেলমণ্টের এই সব রাসায়নিক গবেষণায় আধুনিকতার ছাপ বিশেষ ভাবে প্রকট ছিল। তবুও অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, এ হেন পণ্ডিত ব্যক্তিটি কিন্তু কিমিয়া বিদ্যার সমর্থক ছিলেন। তিনি নিজেই বলে গেছেন যে, একবার এক বিদেশী কিমিয়াবিদের কাছ থেকে তিনি এক গ্রেণ এর এক চতুর্থাংশ আন্দাজ ওজনের পরশ পাথর পেয়েছিলেন সেটা ছিল লাল রঙের চূর্ণ পদার্থ অথচ কাচের মতো স্বচ্ছ ও ঝকঝকে। তাতে জাফরানের মতো গন্ধও ছিল। হেলমণ্ট সামান্য পরিমাণ পরশ পাথরকে মোমের আবরণের মধ্যে রেখে গরম পারদের মধ্যে ফেলে দিয়ে লক্ষ্য করেন যে, পারদ ক্রমশঃ গাঢ় হচ্ছে। উষ্ণতা আরও বাড়ালে পর অবাক বিস্ময়ে হেলমণ্ট সমগ্র পদার্থটিকে বিশুদ্ধ সোনায় পরিণত হ'তে দেখেন।—ভ্যান হেলমণ্টের লেখা এই বর্ণনা পড়ে বেশ বোঝা যায় যে তিনি প্রাচীন কিমিয়াবিদ্‌দের মত ধাতুর রূপান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন—পরশ পাথরের অলৌকিক প্রভাবে।

যাই হোক, একজন চিকিৎসক হ'য়েও রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভ্যান হেলমণ্টের এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্যিই প্রশংসনীয়। 1644 খ্রীষ্টাব্দের 30শে ডিসেম্বর তারিখে এই কৃতী বিজ্ঞানী ব্রুসেল্‌সে দেহত্যাগ করেন।

প্রবাসে ভারতীয় বিজ্ঞানী
টি. ভি. রাজন

একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। ডাক্তার রাজন গত পনের বছর ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এবং এক আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে ক'রে সে দেশেই সংসার পেতেছেন। তিনি আমেরিকার নাগরিকতাও গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে এদেশে এসে তিনি কি দেখলেন? তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি।—"বিজ্ঞানীদের সমাবেশে মূল উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন একজন রাজনীতিবিদ এবং অধিকাংশ বিজ্ঞানী যেন তাঁর বক্তৃতা শোনার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। এটা বিজ্ঞানীদের মিলন স্থল না রাজনীতিবিদ্‌দের সভা—তা আমার বোধগম্য হলো না!"

ডাক্তার 'রাজন দেশে ফিরে আসতে খুবই আগ্রহী তবে সেই সঙ্গে ভীতিও বটে, পাছে এ কুল দুই-যায়।

"স্বদেশে এসে গত কয়েকদিন যাবৎ কয়েকটি বিজ্ঞান সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমার দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছি। আলোচনার ফলাফল থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমার আসাটা যদি তাঁদের স্বার্থের অনুকূল হয় তবে তাঁরা আমাকে স্বাগত জানাবেন কিন্তু তা না হলে তাঁরা আমাকে পাত্তাই দেবেন না। এর থেকে আমার মনে হয় যে ওঁরা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের উন্নয়নে আগ্রহী নন্। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী।'—কথাগুলি বলেছিলেন ডাক্তার টি. ভি. রাজন, যিনি বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালবার্ট আইন স্টাইন কলেজ অফ মেডিসিন-এ কর্মরত

অমরনাথ রায়

সায়েন্স রিপোর্টার-এর সৌজন্যে

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

রূপায়ণ-গৌতম কর্মকার

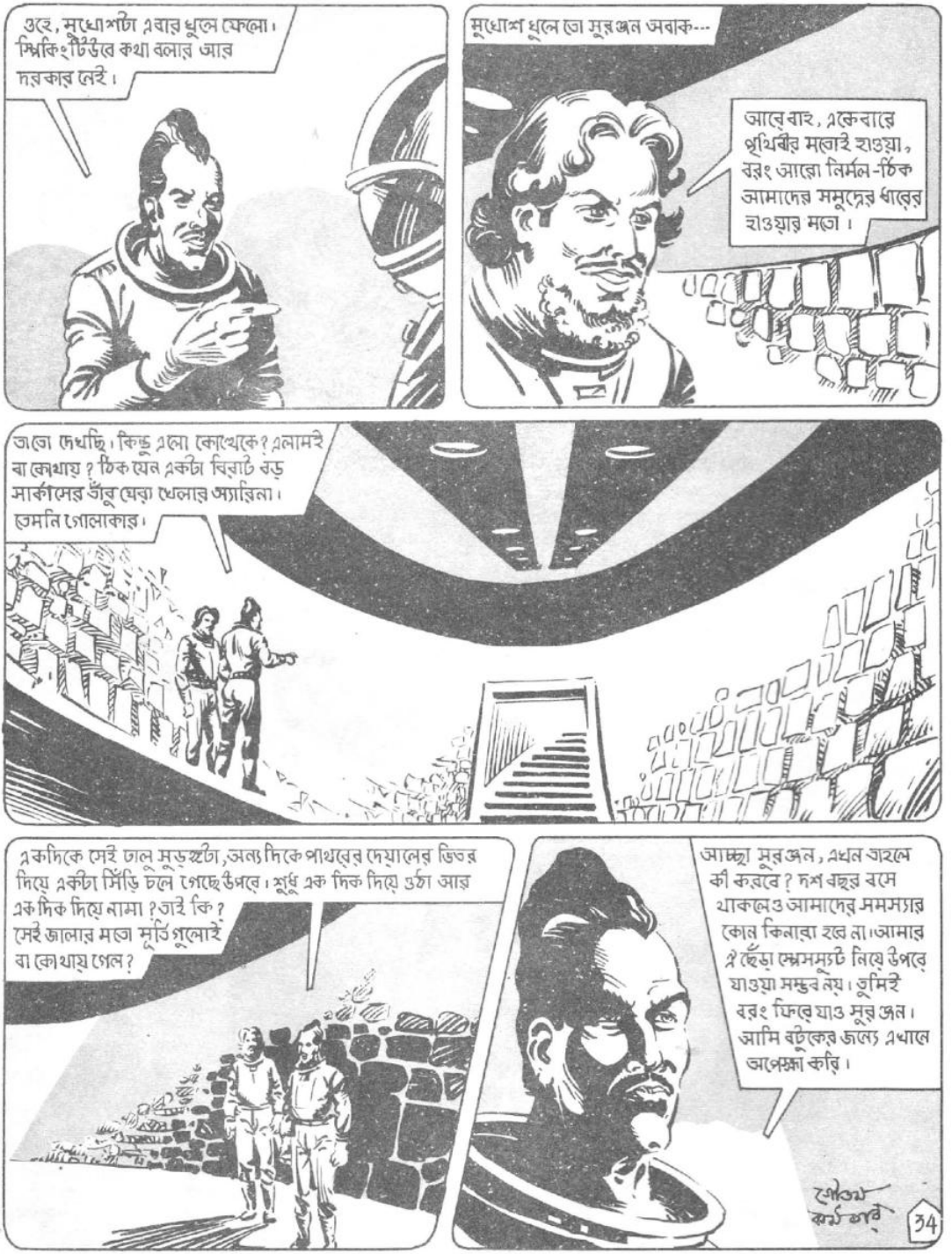

ওহে, মুখোশটা এবার খুলে ফেলো। স্পিকিং টিউবে কথা বলার আর দরকার নেই।
মুখোশ খুলে তো সুরঞ্জন অবাক---
আরে বাহ, একেবারে পৃথিবীর মতোই হাওয়া, বরং আরো নির্মল-ঠিক আমাদের সমুদ্রের ধারের হাওয়ার মতো।
তাতো দেখছি। কিন্তু এলো কোত্থেকে? এলামই বা কোথায়? ঠিক যেন একটা বিরাট বড় সার্কাসের তাঁবু ঘেরা খেলার অ্যারিনা। তেমনি গোলাকার।
একদিকে সেই ঢালু সুড়ঙ্গটা, অন্য দিকে পাথরের দেয়ালের ভিতর দিয়ে একটা সিঁড়ি চলে গেছে উপরে। শুধু এক দিক দিয়ে ওঠা আর এক দিক দিয়ে নামা? তাই কি? সেই জালার মতো মূর্তিগুলোই বা কোথায় গেল?
আচ্ছা সুরঞ্জন, এখন তাহলে কী করবে? দশ বছর বসে থাকলেও আমাদের সমস্যার কোন কিনারা হবে না। আমার ঐ ছেঁড়া স্পেসস্যুট নিয়ে উপরে যাওয়া সম্ভব নয়। তুমিই বরং ফিরে যাও সুরঞ্জন। আমি বটুকের জন্যে এখানে অপেক্ষা করি।
34

না ঘনাদা। দু'জনের যখন যাবার উপায় নেই তখন এখানে একা আমিই থাকবো। আপনার জায়গায় আমি থেকে কোন লাভও হবে না। আপনি বরং লুটভিকের কাছে কায়দা করে শূন্যযান চালাবার কল-কৌশলগুলো শিখে নিয়েছেন। দরকার হলে তার কাছ থেকে আরো কিছু জেনে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবেন।

সুতরাং আপনিই পোষাকটা পরে নিয়ে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।

তোমার নিঃস্বার্থতার প্রশংসা করি সুরঞ্জন। তোমার হৃদয়টা সত্যিই বড়।

কিন্তু বটুকের খোঁজ না নিয়ে আমিই বা কী করে যাই বলো? তার যদি সারাজীবন এখানে কাটাতে হয় সেও তো ভাল। হ্যাঁ, সত্যিই তাই ভাল।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই ভাল।

চমকে উঠলাম আমরা। আশ্চর্য! পরিষ্কার বাংলা কথা, তাও আবার নারীকণ্ঠে!

মেয়ের গলা!

তার ওপর বাংলা!

মঙ্গলগ্রহে বাঙালী মেয়ে?

35

না, মঙ্গলগ্রহে বাঙালী মেয়ে কেউ ছিল না। কিন্তু বাঙালী ছেলে দুটিকে ওখানেই রেখে আসতে হোল।
তাইতো ভাবছিলাম, বটুকের যদি অমন চিল-চোখ না হোত।
সত্যি, তাহলে ওই জালা-জন্তুগুলো দেখাও যেতো না। আর দেখা না গেলে সুরঙ্গলেরও নেমে দেখার অমন ঝোঁক হোত না। তাকে অমন নির্বাসনেও রেখে আসতে হোত না। তাই না ঘনাদা?
ইস, একটা জালা-জন্তু যদি ধরে আনতে পারতেন? আপনিও পারলেন না?
কই আর পারলাম! তার বদলে তারাই দু'জনকে আটকে রাখলো। আর ইতিহাসের খাতিরে আমিও ওদের ছেড়ে এলাম।
ইতিহাসের খাতিরে?
হ্যাঁ। গ্রহটার ভাবী ইতিহাসের একটা দাবী আছে তো? সে দাবী অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।
তা তো বটেই, তা তো বটেই। নইলে সেখানেই হয়তো 'আমাদের দাবী মানতে হবে' বলে ঘেরাও করতো ইতিহাসের দল।
না হে, সে রকম দাবী নয়, দাবী হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের ইতিহাসের ধারার।
সে ধারা তো তখন শুকিয়ে গিয়ে প্রায় শেষ হতেই বসেছে। অথচ প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন ওখানে পৃথিবীর অনেক আগেই হয়েছিল।
36

[20 পৃষ্ঠার পর]

বুকে। কয়েকটা যন্ত্রের কাঁটা থর থর করে কাঁপতে থাকল।

অর্থাৎ টি. ভি. র পর্দার বুকে উজ্জ্বল করে দেখানো জায়গাটায় কোন বস্তু বা কিছু অপেক্ষা করে রয়েছে যার সঙ্গে 'অভিযাত্রীর' মুখোমুখী সংঘর্ষের আশঙ্কায় জাহাজের স্বয়ংক্রিয় বিপদ ঘণ্টি বেজে উঠেছে। বস্তু নির্দেশক যন্ত্র বেজে উঠছে, আশি হাজার মাইল দূরে কোন একটা দৈত্যাকার অথচ কঠিন কিছু জিনিষ অপেক্ষা করছে।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, সন্ধানী রশ্মিকে বিবর্ধিত করার মুহূর্তে উজ্জ্বলতর জায়গাটার প্রতিচ্ছবি বড় হয়ে উঠল কিন্তু তবু কিছু দেখা গেলনা, নির্দেশক যন্ত্র বলছে ভয়ানক কোন একটা কিছু অভিযাত্রীর দিকে ছুটে আসছে পাগলের মত।

ক্যাপ্টেনের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল। কপালে চিন্তার রেখা।

রাকেশ ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে করতে একসময়ে বলে উঠল, স্যার পৃথিবী থেকে মঙ্গলে যাবার পথে আমাদের জাহাজে এই রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আমাদের পথে আর একটা জাহাজ এসে পড়েছিল। তাদের অনুসন্ধানী রশ্মির তরঙ্গমাত্রা আমাদেরই মত হওয়ার ফলে দুজনের অনুসন্ধানী রশ্মির যোগফলে মনে হচ্ছিল দৈত্যাকার নিরেট কিছু বুঝি ছুটে আসছে আমাদের জাহাজের দিকে।

উত্তেজিত ভাবে ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, তাহলে এখানেও একই ব্যাপার ঘটছে বলে মনে হয়। কিন্তু এরা কারা? মানুষ নিশ্চয় নয়। তবে কি? ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য ইণ্টারন্যাল ফোনে উত্তেজিত ভাবে নির্দেশ দিলেন, 'প্রতিরক্ষা বিভাগ, প্রস্তুত হয়ে যাও। সব বিভাগকে সতর্ক করে দাও। আমরা আক্রান্ত হতে চলেছি।'

—মানুষ নয়! বিস্মিত রাকেশ সাকসেনা ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করল, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন কি --।

—আমাদের ছায়াপথে কত সৌর জগৎ—কত উন্নত সভ্যতা থাকতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে কি? আমরা এতদিন এদেরই প্রতীক্ষায় ছিলাম না কি? আর আজ···।

—আছে, স্যার। প্রায় পাঁচ হাজার সভ্যতার অস্তিত্ব সম্ভব।

—তবে এরা তাদেরই একজন। উত্তেজনায় কাঁপছিলেন ক্যাপ্টেন। বছরের পর বছর ধরে আমরা যাদের সন্ধান করে এসেছি তারা এখন আমাদের মুখোমুখি। ছায়াপথের আর এক সভ্যতার দেখা পেতে চলেছি আমরা। প্রস্তুত হও।

—আপনার কি মনে হয় ওদের আচরণ বন্ধুত্বপূর্ণ হবে?

—একটি যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, ওটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। যদি একটা অচেনা মহাকাশযান আমাদের দিকে এমন ভাবে ছুটে আসে তাহলে আমরা কি করব? বন্ধুত্ব? হতে পারে। তবে আমাদের যোগাযোগের চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু এও মনে রাখা দরকার যে আমাদের 'অভিযানের' এইখানেই ইতি হতে পারে। ভাগ্য ভাল যে আমাদের জাহাজের 'ব্লাস্টার' গুলো সক্রিয় রয়েছে।

ব্লাস্টার হচ্ছে সেই আলোক রশ্মি যা জাহাজের পথে পাঁচহাজার মাইল দূরের কোন উল্কা পিণ্ড বা গ্রহাণু-পুঞ্জকে ধ্বংস করে জাহাজের পথ বিপদহীন করে তুলতে পারে।

রাকেশ সাকসেনা বলল, 'ব্লাস্টার' কেন স্যার? ব্লাস্টার দিয়ে কি হবে? ব্লাস্টার ব্যবহার করব কেন?

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য টি. ভি. র শূন্য পর্দাটার দিকে দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা জানিনা ওদের মতলবটা কি? সুতরাং আমরা কোন রকম ঝুঁকি নিতে পারিনা—যদিও আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। জানবার চেষ্টা করব ওরা কোথা থেকে আসছে। বন্ধুত্ব করার চেষ্টাও করব। কিন্তু তবু ওদের সামান্যতম বিশ্বাস করতে পারব না। কারণ, ওদের নিশ্চয় 'লোকেটর' অর্থাৎ অবস্থান খুঁজে বার করার যন্ত্র রয়েছে। সম্ভবতঃ আমাদের থেকেও উন্নততর। হয়ত দেখব আমাদের অজান্তেই ওরা আমাদের অনুসন্ধান করছে। তারপর একদিন দেখব যে বিশাল এক নৌবহর নিয়ে ওরা আমাদের সৌরজগতের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ব্যবসা করতেও আসতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করব কেমন করে? পৃথিবীর মরন-বাঁচন নির্ভর করছে তারা কি করবে না করবে তার ওপর। তাদের মনের কথা জানার কি কোন উপায় আছে?

রাকেশের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য মাইক্রোফোনে 'অভিযাত্রীর' পরিচালনা বিভাগকে নির্দেশ পাঠালেন, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সমস্ত নাক্ষত্রিক মানচিত্র, সমস্ত ফটোগ্রাফ, সমস্ত রকমের তথ্য সম্বলিত দলিল পত্র এমন ভাবে প্রস্তুত রাখুন যাতে মুহূর্তের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে ফেলা যায়। আমি চাই না যে ভিনগ্রহীরা আমাদের পৃথিবীর অবস্থান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারনা অর্জন করতে সক্ষম হোক। কোন মূল্যেই তাদের পৃথিবীর পথ জানতে সহায়তা করতে পারি না। পৃথিবীর সভ্যতা, তার কোটি কোটি মানুষের জীবনের দায়িত্ব এখন আমাদের হাতে। মূর্খের মত আচরণ করে তাদের বিপন্ন করে তোলার কোন অধিকার আমাদের নেই।

রাকেশ সাকসেনা হঠাৎ বলে উঠল, এই যে স্যার।

দেখা গেছে। কুয়াশার মধ্যে বহু দূরে ছোট্ট একটা কালো জিনিষ দেখা গেল। পালিশহীন কালো মত একটা ছোট্ট বস্তু। 'অভিযাত্রী'র গায়ের মত ঝকঝকে পালিশ করা মোটেই নয়।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্যের আঙ্গুল 'ব্লাস্টারে' বোতামের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। বোতামটা টেপা সহজ। 'কিন্তু'!—এক বিশাল 'কিন্তু' এসে অনড় করে রেখেছে ক্যাপ্টেনের আঙ্গুল গুলোকে; যদি ওরা সত্যিই বন্ধুভাবাপন্ন হয়? তাহলে চক্ষের পলকে যুগ যুগান্তরের ভিন্ন সভ্যতার জন্যে কি মিলন প্রতীক্ষা তা বিফলে যাবে। ছায়াপথে নতুন ইতিহাস গড়ে ওঠার আগেই বিনষ্ট হবে। কিছু করে ফেলার আগে ভিনগ্রহীদের পরবর্তী কার্যক্রম দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম গড়াতে লাগল—প্রতিরক্ষা বিভাগ মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল, ভিনগ্রহী জাহাজটাও থেমেছে, স্যার। আমাদের 'ব্লাস্টার' গুলো লক্ষ্য স্থির রেখেছে। শুধু আপনার সংকেতের অপেক্ষা। ওরা একটা বিশেষ ভাবে নিয়ান্ত্রিত বেতার তরঙ্গে কোন কিছু সংকেত পাঠিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

দাঁতে দাঁত চেপে ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, ওদের জাহাজের দরজা বোধ হয় খুলছে। সহায়ক 'ব্লাস্টার'টার লক্ষ্য দরজার ওপর স্থির রাখ।

ছোট্ট গোলাকার একটা কিছু জাহাজটা থেকে বেরিয়ে এল।

মাইক্রোফোনে প্রতিরক্ষা বিভাগ জানাল, গোলাকার বস্তুটা স্থির হয়ে আছে। জাহাজটা পিছিয়ে যাচ্ছে। আরও সংকেত আসছে। বোঝা যাচ্ছে না। ওগুলো শব্দতরঙ্গ নয়। চিন্তা তরঙ্গ।

রাকেশ স্থির দৃষ্টে টি. ভি.র পর্দাটার দিকে তাকিয়েছিল। ক্রমে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, এ ভালই হল স্যার। ওরা যদি কোন কিছু আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিত—আমরা ভাবতাম ওরা বুঝি কোন অস্ত্র ছুঁড়ল। তা না করে ওরা যোগাযোগ করার জন্যে বোধহয় একটা 'লাইফ বোট' নামিয়ে দিয়ে সরে গেল। ওরাও নিশ্চয় চাইছে—আমরাও ঐভাবে যোগাযোগ করি। এতে আমাদের কারোর জাহাজের কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য চিন্তান্বিত ভাবে বললেন, রাকেশ, তুমি বাইরে গিয়ে কি দেখবে জিনিষটা কি? জাহাজের অন্য সব কর্মচারীরাই এখন মহা প্রয়োজনীয়—তাই···।

আমার ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার কাজ তো শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং, আমিই একমাত্র লোক—যার অভাবেও জাহাজ সচল থাকবে—আমি জানি. স্যার। পৃথিবীর স্বার্থে আমি হাসিমুখে এই বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। তবে আমি কোন লাইফ বোটে যাব না। বরং (স্বয়ংচালিত) মহাকাশচারীর জেট লাগানো পোষাকেই আমি যাব। সঙ্গে একটা 'স্ক্যানার' নেবো—যাতে আপনারা জাহাজে বসে সবটুকু দেখতে পান স্পষ্টভাবে।

ভিনগ্রহী জাহাজটা এক'শ, দু'শ ক্রমে চার'শ মাইল দূরে গিয়ে স্থির হয়ে রইল। রাকেশ সাকসেনা 'অভিযাত্রী'র 'এয়ার লক' দিয়ে বেরিয়ে এল। জোড়া সূর্যের জন্যে মহাশূন্যে অসীম উজ্জ্বলতা। পেছনে অভিযাত্রী'ও দূরে সরে যেতে থাকল। নিঃসীম মহাশূন্যের বুকে ভর দিয়ে স্বয়ংচালিত মহাকাশচারীর পোশাকে নির্ভীকভাবে সে এগিয়ে চলল শূন্যে ভাসমান ছোলার মত দেখতে কালো বস্তুটার দিকে। শিরস্ত্রাণের ফোনে ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রাকেশ। আমরাও পিছিয়ে যাচ্ছি। হয়ত প্রয়োজন নেই। তবু সাবধান হওয়া ভাল। 'স্ক্যানার'টাকে বস্তুটার দিকে নির্দিষ্ট করে রাখ।

রাকেশ বস্তুটার কাছে গিয়ে দেখল প্রায় ছ'ফুটের ব্যাসের একটা গোলক। বেশ কয়েকটা শুঁড় বেরিয়ে আছে তার গা থেকে। নিকষ কালো, জালিকা হীন। —আমি পৌঁছে গেছি। রাকেশ অভিযাত্রী'কে জানাল। একটা ধাতব গোলক। 'স্ক্যানারে দেখতে পাচ্ছেন তো?

হঠাৎই গোলকটার গায়ে একটা দরজা খুলে গেল। ভয় মিশ্রিত আতঙ্ক নিয়ে দু' এক মুহূর্ত খোলা দরজাটাকে লক্ষ্য করল রাকেশ। না কেউ বেরিয়ে এল না। তারপর সে সাহস করে একটা শুঁড় ধরে কোন রকমে গোলকটার ওপরে উঠে পড়ল—উদ্দেশ্য ভেতরটা দেখা। কিন্তু সে যা দেখল তাতে তার বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। ভেতরে শুধুমাত্র একটা বড় কালো প্লেট। তার গায়ে নানান লাল আলো জ্বলছে-নিভছে।

ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রাকেশ, ঠিক আছে রাকেশ। ওরা একটা 'ইনফ্রারেড'—অবলোহিত আলোর ভিশন প্লেটের সাহায্যে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। স্ক্যানারটা ভিশন প্লেটটার দিকে স্থির করে রেখে তুমি ফিরে এস। আমি অন্য কাউকে দিয়ে আমাদের একটা 'ভিশন প্লেট' পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—জাহাজটা কোথায়? উজ্জ্বল আলোয় কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কোন দিকে যাব? রাকেশ প্রশ্ন করল।

—জোড়া সূর্যের ঠিক উল্টো দিক বরাবর এগিয়ে এস। আমরা তোমাকে তুলে নেবো। ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য জানালেন।

'অভিযাত্রী' এসেছিল কর্কট নীহারিকা আর তার জোড়া সূর্যের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। জোড়া সূর্যের—একটার বুকে 2946 খৃঃ পূঃ এক অতিকায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ফলে তার বস্তুপুঞ্জ ছিটকে পড়েছিল মহাবিশ্বে। প্রথম দিকে সেই বস্তুপুঞ্জের গতিবেগ ছিল মিনিটে আটত্রিশ হাজার মাইলেরও বেশি বা সেকেণ্ডে ছ'শ আটত্রিশ মাইলের মত। 1054 খৃষ্টাব্দে চীনা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

এই বিস্ফোরণের কথা লিখে গিয়েছিলেন। এটা এত উজ্জ্বল ছিল যে দিনের আলোতেও তেইশ দিন ধরে দেখা গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর টেলিস্কোপগুলো যখন এই জায়গাটার দিকে তাকান তখন শুধুমাত্র দুটো সূর্য—আর এই নীহারিকাটি রয়ে গেছে। কর্কটের মত ঐ গ্যাসপুঞ্জের আকৃতি বলে এর নাম হল কর্কট নীহারিকা। দুটোর মধ্যে উজ্জ্বলতম সূর্যটির উপরিভাগের উত্তাপ এত বেশি যে বর্ণালী বিশ্লেষণে এর কোন রঙই দেখা গেল না। বড় সূর্যটার উপরিভাগের তাপমাত্রা যেখানে সাত হাজার ডিগ্রী এ্যাবসলুট, যেখানে ছোট বা বামন সূর্যটার উত্তাপ 500,000, অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ ডিগ্রী! এর ভর প্রায় আমাদের সূর্যের সমান কিন্তু ব্যাস মাত্র তার এক পঞ্চমাংশ। ফলে এর ঘনত্ব জলের 173 গুণ বেশি। বামন সূর্যটা এখনও পুরোপুরি 'সাদা বামনে' পরিণত হয়নি। এখনও মাধ্যাকর্ষণের চাপে সংকুচিত হয়ে চলেছে। 'অভিযাত্রীর' এইসব পর্য্যালোচনা এখন বাতিল হয়ে গেছে। তার জায়গায় এসে জুড়ে বসেছে ভিনগ্রহী মহাকাশযানটা।

দুটো মহাকাশ যানই এখন নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে লক্ষ্য করছে। ভাষার জন্যে কোন যোগাযোগই স্থাপন করা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত রাকেশ সাকসেনা ক্যাপ্টেনকে বলল, স্যার একটা উপায় ঠিক করেছি। ওদের বেতার তরঙ্গগুলো আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে মোটামুটি অনুবাদ করে নিতে পারছি এবং ওরাও ওদের মত করে নিচ্ছে আমাদের তরঙ্গগুলোকে। ওদের বেতার তরঙ্গ দেখে মনে হচ্ছে ওরা টেলিপ্যাথিতে কথা বলে। শব্দ ব্যবহার করে না। কিন্তু স্যার, সমস্যা হচ্ছে, কেউ কাউকে সত্য বলছে না। আমরা আমাদের অবস্থানের একটা মনগড়া নাক্ষত্রিক ম্যাপ দেখালাম। পরিবর্তে ওরা আয়নায় উল্টে সেই ম্যাপটাই আমাদের দেখাল! এভাবে কদিন চলবে? আমাদের একজনকে কি ধ্বংস হতেই হবে? আমরা দুজনে কি যে যার ঘরে ফিরে যেতে পারব না?

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, না। কারণ, আমরা যাত্রা করলে ভাবব, ওরা বুঝি আমাদের অনুসন্ধান করছে। ওরা যাত্রা করলে ওরাও তাই ভাববে। সুতরাং? সুতরাং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যে বাঁচবে সেই কেবল নিরাপদে নিশ্চিন্তে ফিরতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধ...! দুই সভ্যতার মহা-মিলনের সম্ভবনাটাকে ধ্বংস করে যুদ্ধ? নিজের সভ্যতার কাছে আমরা কি জবাব দেবো? এ যেন উভয় সংকট!

রাকেশ সাকসেনা মাথা চুলকালো। —তাই তো স্যার। দেখি চিন্তা করে—আমি অন্য কোন উপায় বার করতে পারি কিনা? আর দু একদিন আমায় সময় দিন।

এর মধ্যে দুটো জাহাজের দুরকম রং হওয়ার কারণটা অবশ্য জানা গেল। 'অভিযাত্রী'র গাত্রাবরণ আয়নার মত ঝকঝকে কারণ মহাশূন্যের তাপ প্রতিফলিত করে সে তার ভেতরকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। অন্যদিকে ভিন-গ্রহীরা বিশেষ তরঙ্গের তাপ শোষণ করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অবলোহিত আলোয় দেখে। টেলিপ্যাথিতে কথাবার্তা বলে।

সংবাদ আদান প্রদান হতে হতে যুদ্ধের চিন্তাটা আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠল। কারণ, বেশ বোঝা যাচ্ছিল ভিন-গ্রহীরা তাদেরই মত হৃদয়বান জীব। তাদের চিন্তাধারাও মানুষের অনুরূপ।

শেষ পর্যন্ত রাকেশ সাকসেনা একটি পরিকল্পনা নিয়ে হাজির ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্যের কাছে। —স্যার। এটাই শেষ উপায়।

—বিষণ্ণ হেসে ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, সব উপায় যখন দেখা হল তখন এটা আর কেন বাকি থাকে? বেশ, চল, দেখা যাক। ওদের খবর দাও। দেখ, ওরা এই প্রস্তাবে সম্মত কিনা?

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য ঠিক করলেন, তিনিও রাকেশের সঙ্গে এই অভিযানে যাবেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমত, তিনি উৎকণ্ঠায়, উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর আর রাকেশের যদি মৃত্যুও হয় তবু কম্পিউটারের সাহায্যে 'অভিযাত্রী' সঠিক পথে পৃথিবীতে ফিরতে পারবে। তৃতীয়তঃ, যদি যুদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় কেউ বাঁচবে না। দুটো জাহাজই ধ্বংস হবে। চতুর্থতঃ তিনি সঙ্গে থাকলে রাকেশের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রস্তাব হয়েছে দুই জাহাজ থেকে দুজন করে লোক অন্যের জাহাজে যাবে। তাদের কাজকর্ম দেখবে। ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ আলোচনা করবে। ভিনগ্রহীরা এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।

ভিনগ্রহীদের মহাকাশ যানটা 'অভিযাত্রী'র মতই বিশাল কিন্তু আরও বেশি পুরু। ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য আর রাকেশ সাকসেনা জাহাজের খোলা এয়ার লক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। ভেতরের দরজাটা খুলে গেল।

গাঢ় অন্ধকার। দুজনে শিরস্ত্রাণের লাইট জ্বালিয়ে নিলেন। যেহেতু ভিনগ্রহীরা অবলোহিত আলোয় দেখে—তাই সাদা আলো তাদের কাছে অসহ্য। তবু চোখ মিটমিট করে তারা দুজনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। ভিনগ্রহীদের বক্তব্য 'অভিযাত্রী' থেকে অনুদিত হয়ে রাকেশের হেডফোনে শোনা গেল। —স্যার, ভিন-গ্রহীরা বলছে যে ওদের ক্যাপ্টেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

নরম গালচেয় ঢাকা লম্বা করিডোর দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল। পিছনে পিছনে ভিনগ্রহীরা।

শিরস্ত্রাণটা খুলে ফেলা যাক, স্যার। রাকেশ বলল, এখানকার বাতাস নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য। কারণ, এরাও

অক্সিজেন গ্রহণ করে। অবশ্য মাত্রার সামান্য হেরফের আছে যেমন আছে 'অভিযাত্রী' আর এই জাহাজের কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণের হেরফের। সুতরাং অনুমান করা চলে ভিন গ্রহীদের পৃথিবী ছোট এবং তা এক লাল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

একটা হলঘরে পৌঁছে সবাই থামল। ঘরটার আলোর মাত্রা কিছুটা উজ্জ্বল করা হয়েছে সৌজন্যের খাতিরে। যদিও ভিনগ্রহীদের বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল ঐ উজ্জ্বল আলোকে।

ভিনগ্রহী ক্যাপ্টেন হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো। 'অভিযাত্রী' থেকে তাঁর বক্তব্য অনুদিত হয়ে এল। রাকেশ বলল, স্যার, ভিনগ্রহী ক্যাপ্টেন আমাদের স্বাগত জানিয়ে বলছেন যে এই সাক্ষাৎকারে তিনি খুব প্রীত। তাঁর কাছে সমস্যা সমাধানের একটা পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, নিশ্চয় যুদ্ধের কথা বলছেন। বল, আমাদেরও একটা প্রস্তাব রয়েছে।

ভিনগ্রহী ক্যাপ্টেনের চিন্তা তরঙ্গ 'অভিযাত্রী' থেকে অনুদিত হয়ে শব্দ তরঙ্গে পরিবর্তিত হল। —তিনি জানতে চাইলেন প্রস্তাবটা কি? আপনারাই আগে জানান।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, যুদ্ধ হলে কেউই লাভবান হবে না। কারণ, দুজনেরই ধ্বংস অনিবার্য। আমাদের নিজের নিজের সভ্যতার কেউই অন্য সভ্যতার কথা জানতেও পারবে না। ফলে কেউই লাভবান হবে না। কিন্তু যদি, আমরা পরস্পর জাহাজ দুটো বদলিয়ে নিই—অনুসরণকারী যন্ত্র আর অস্ত্রগুলোকে নষ্ট করে ফেলি, নিজের নিজের নাক্ষত্রিক ম্যাপ এবং তথ্য সম্বলিত অন্যান্য কাগজপত্র এ জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে নিয়ে যাই—তাহলে আমাদের একের পক্ষে অন্যকে অনুসরণ করার সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা নিশ্চিন্তে যে যার জগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। অথচ বদলিয়ে নেওয়া জাহাজ দুটোই পরস্পরের সভ্যতার কাছে পরস্পরের অস্তিত্বের সাক্ষী হবে। এতেই আমরা মহালাভবান হতে পারি। তারপর যদি আমাদের সরকাররা পরস্পরে সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী হন তাহলে এই জোড়া সূর্যের এক সম্পূর্ণ আবর্তন কালের পরে আমরা আবার এসে হাজির হব এই কর্কট নীহারিকার বুকে। দুই সভ্যতার মিলনে মহাবিশ্বে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে।

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্যের বক্তব্য চিন্তা তরঙ্গে রূপান্তরিত হলে ভিনগ্রহীদের ক্যাপ্টেনের কানে গেল। তিনি প্রশ্ন করলেন, আর যদি এ প্রস্তাব না মানি? তাহলে?

উত্তেজিত ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য বললেন, তাহলে আমাদের 'অভিযাত্রী' থেকে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে আমাদের পোশাকের ভেতরে লুকোন আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। এতে আমরা দুজনে ধ্বংস হয়ে যাব ঠিকই—কিন্তু আপনারাও বাঁচতে পারবেন না।

ভিনগ্রহী ক্যাপ্টেন এক নিঃশব্দ হাসিতে প্রায় লুটিয়ে পড়লেন। অভিযাত্রী থেকে অনুবাদকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, স্যার, উনি হাসছেন, কারণ, ওনার প্রস্তাবটাও নাকি অবিকল এক রকমের। আমাদের জাহাজে যে দুজন ভিন গ্রহী পরিদর্শক এসেছে—তাদের পোষাকেও নাকি আণবিক অস্ত্র লুকোন আছে!

ক্যাপ্টেন ভট্টাচার্য ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন ভিন গ্রহী ক্যাপ্টেনকে! মাসাধিক কালের উত্তেজনা—উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল এত সহজে! এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এক সময়ে জাহাজ বদলের পালা সাঙ্গ হল। একে অন্যের জাহাজের পরিচালন পদ্ধতি শিখে নিল। 'অভিযাত্রী'র উজ্জ্বল আলোকগুলো খুলে নিয়ে মৃদু লাল আলো লাগানো হল। ভিনগ্রহী যানে লাগানো হলো উজ্জ্বল আলোক। তারপর একদিন পরস্পরের সদিচ্ছার বাসনা নিয়ে দুজন দুজনের জগতের দিকে যাত্রা করল।

ফিরে আসার পথে এক সময়ে রাকেশ বলল, স্যার, আপনার কি কিছুমাত্র আশ্চর্য লাগেনি ব্যাপারটায়? কি করে ওরা আমাদের অনুরূপ পরিকল্পনা করেছিল? দুজনের পরিকল্পনা এক কি করে হোল?

—তা হয়েছিল। কিন্তু কেমন করে হলো? বুঝতে পারছি না।

—আসলে স্যার, ওরা মোটেই খারাপ জীব নয়। ওদের অনুবাদক এখন আমার বন্ধু—হ্যাঁ স্যার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। আমরা দুজনে পরিকল্পনা করে যে যার ক্যাপ্টেনের কাছে পরিকল্পনাটা পেশ করেছিলাম! ওরাও স্যার আমাদের মত সংসারী জীব। কেউ কারোর মৃত্যু কামনা করতে পারছিল না। আমি বলে রাখছি স্যার—এই দুই সভ্যতার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে কোন অসুবিধেই হবে না। কারণ, আমাদের আলোর জগৎ ওদের ভাল লাগবে না যেমন ওদের অন্ধকার জগৎ আমরাও মোটে পছন্দ করব না। ফলে, দখল করার প্রশ্নটাই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে।

ভিনগ্রহী এক মহাকাশযানে পৃথিবীর মানুষ ছায়াপথের আর এক সভ্যতার সংবাদ নিয়ে অকল্পনীয় গতিতে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসছিল।

[বিদেশী ছায়ায়]

---

3 সীতাকান্ত ব্যাজী লেন, কলকাতা-5

কম্পিউটার কি কি পারে / শুভব্রত চৌধুরী

যে কোন তথ্যকে সরাসরি একটা কমপিউটারে প্রবেশ করান যায় না। প্রথমে এই তথ্যকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে মেশিন সেই রূপান্তরিত তথ্য গ্রহণ করতে পারে।

ছিদ্র যুক্ত কার্ড (Punch Card)

বাজারে এ ধরণের কার্ড কিনতে পাওয়া যায়। এই কার্ড শক্ত কাগজের তৈরী এবং নির্দিষ্ট মাপ ও ঘনত্ব আছে। সাধারণত এই কার্ডে মোট 80টি কলম থাকে। প্রতিটি কলমে 12টি করে অক্ষর ছিদ্র করবার ব্যবস্থা রয়েছে, অক্ষরের মধ্যে বর্ণমালা, সাংকেতিক চিহ্ন, এবং সংখ্যায় ছিদ্র করা যায়। ইংরাজী বর্ণমালা মোট 26টি। অথচ প্রতিটি কলমে মোট 12টি জায়গা। সুতরাং কিভাবে এদের ধরান যায় এজন্য বিজ্ঞানীরা এই বর্ণমালাকে 3টি গ্রুপে ভাগ করেছিলেন। 9, 9 এবং 8টি করে অক্ষর প্রতিটিতে। A-I, J-R এবং S-Z। কার্ডে যখন সমান অক্ষর / বর্ণমালা ছিদ্র করা হবে তখন কার্ডের উপরের তিনটি কেন্দ্র ব্যবহার করা হবে। আবার কার্ডে যখন সংখ্যাকে ছিদ্র করা হবে তখন বাকী 9টি কেন্দ্রকে ব্যবহার করা হবে।

একটি কার্ডে 26টি বর্ণমালাকে কিভাবে বোঝান হয়। প্রথমে 12 জোন একটা বর্ণমালা গ্রুপকে ধরতে পারে। A-I 11 জোন আরও একটি বর্ণমালা গ্রুপকে ধরতে পারে। J-R 0 জোন আরও বাকী 8টি গ্রুপকে ধরতে পারে। S-Z

এবার বর্ণমালা অনুযায়ী একটি কার্ডে তাদের সংকেত কেমন হবে সেটা দেখান হোল।

A—12 1	প্রতিটি কার্ডে 12 জোন ও 1 এ 2টি ছিদ্র করবে।	J—11 1	
B—12 2		K—11 2	প্রতিটি কার্ডে 11 জোন এবং 2এ ছিদ্র করবে
C—12 3		L—11 3	
D—12 4		M—11 4	
E—12 5		N—11 5	
F—12 6		O—11 6	
G—12 7		P—11 7	
H—12 8		Q—11 8	
I—12 9		R—11 9	
S—0 2		X—0 7	প্রতিটি কার্ডে 0 জোন এবং 7 এ ছিদ্র করবে।
T—0 3		Y—0 8	
U—0 4		Z—0 9	
V—0 5			
W—0 6			

তাহলে আমরা যদি KISHORE JNAN B'JNAN শব্দগুলি একটা কার্ডে ছিদ্র করি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখা যাক।

এই কার্ডগুলো একটি যন্ত্রের মাধ্যমে ছিদ্র করা হয়। এবং ছিদ্রটি ঠিক হয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখার (Verify) ব্যবস্থাও এই মেশিনগুলোতে থাকে। ছবিতে ঐ গর্তগুলো যখন ছিদ্র দিয়ে যাবে, তখন সেটিকে কমপিউটারে প্রবেশ করানর আগে আরও একটি অংশ 'কার্ড রিডার' এর মধ্যে অণুপ্রবেশ করান হয়। সেখানে এই কার্ডগুলোর ছিদ্র করা অক্ষরগুলো বাইনারী স্ট্রীং এর মাধ্যমে কমপিউটারে রূপান্তরিত হয়ে পেঁছে যায়।

আধুনিক কমপিউটারে এক ধরণের কাগজের টেপ ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে ছিদ্র করেও তথ্যকে ধরে রাখা যায়। একটা রিল থেকে এই কাগজগুলো সরাসরি মেশিনে প্রবেশ করে চলতে পারে। এই টেপ থেকে প্রতিটি সেকেণ্ড প্রায় 2000 অক্ষর পড়া সম্ভব।

তথ্যকে ধরে রাখবার জন্য আধুনিক জগতে আরও একটি উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। এর নাম Key to Tape / Disk। অর্থাৎ বোতাম টিপে সরাসরি টেপ করে রাখা যায় যে কোন তথ্যকে। এতে পানচ্ করবার জন্য কার্ডের প্রয়োজন হয় না এবং খুব অল্প সময় লাগে। এবং কার্ড রিডারের প্রয়োজন হয় না। সরাসরি টেপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কমপিউটার কাজ করতে পারে। 'Key to Tape' যন্ত্রটির যে কিবোর্ড থাকে সেটিকে আধুনিক টাইপ রাইটারের মতো অনেকটা দেখতে। শুধু টেপ নয়, তথ্যকে ডিস্কেও ধরে রাখা যায়। ডিস্ক একটি একসঙ্গে টেপের তুলনায় প্রায় 10 গুণ বেশী তথ্যকে ধরে রাখতে পারে।

তথ্য কিভাবে একটি টেপ ও ডিস্কের মাধ্যমে কমপিউটারে প্রবেশ করে তার সংকেত দেখান হোল।

কম্পিউটারে যোগাযোগ (Computer Controled Communications)

কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং কম্পিউটার মারফৎ তথ্য আদান প্রদান করবার জন্য বর্তমানে টেলিটাইপ-রাইটার বা ভিস্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট টারমিনাল ব্যবহার করা হয়। দুটো যন্ত্র প্রায়ই এক রকম। এদের সঙ্গে একটা টাইপ রাইটারের মতো কী বোর্ড থাকে যার সাহায্যে কম্পিউটারে সরাসরি তথ্য পাঠান যায়। তা ছাড়া কম্পিউটার থেকে দেশ দেশান্তরে যোগাযোগও সম্ভব হয়, এই টারমিনালগুলো বিভিন্ন রকমের হয়।

ক. টেলিটাইপ, খ. ভিস্যুয়াল ডিসপ্লে, গ. ইন-টেলিজেন্ট, ঘ. ব্যাচ প্রোসেসিং, ঙ. স্পেসালাইজড।

ক. টেলিটাইপ টারমিনালের চেহারাটা অনেকটা টাইপ রাইটারের মত। হাতে টাইপ করে তথ্যকে পাঠাতে হয়। কী বোর্ডে বর্ণমালা ও সংখ্যা ছাড়াও কিছু কিছু Command স্যুইচ থাকে যার সাহায্যে এই টারমিনাল কম্পিউটারকে নির্দেশিকা পাঠাতে পারে। এক ধরনের বাফার (Buffer) থাকে যার মধ্যে অনেক তথ্য ধরে রাখা সম্ভব।

খ. এদের অনেকটা টেলিভিশনের মতো দেখতে। টেলিভিশন পর্দার নীচে থাকে কী-বোর্ড। যা কিছু টাইপ করা হোক পর্দায় ভেসে উঠে। তথ্য যোগাযোগ এবং আদান প্রদান অত্যন্ত দ্রুত হয়।

গ. কোন কোন টারমিনালের নিজস্ব মিনি কম্পিউটার থাকে এবং সেখানে তথ্যকে প্রোগ্রাম করে সরবরাহ করা সম্ভব। এ ধরনের টারমিনালকে ইনটেলিজেন্ট টারমিনাল বলা হয়।

ঘ. এ ধরনের টারমিনাল তথ্যকে 'ব্যাচমোড' (batch mode) প্রোসেস্ করতে পারে।

ঙ. এ ধরনের টারমিনাল যে কোন ধরনের তথ্যকে যে কোন অবস্থায় গ্রহণ করে তাকে কম্পিউটারে পাঠিয়ে দিতে পারে। যেমন একটা ব্যাঙ্কের পাশ বইকে আপটুডেট করা। ইত্যাদি।

তথ্য নির্গম অঙ্কাংশ (Data Output deviees)

সাধারণতঃ তথ্যকে আমরা সরাসরি ছাপা অক্ষরে পেতে পারি সে পত্রটির মাধ্যমে সেটি হোল। প্রিণ্টার (Printer)

এদের অনেক সময় লাইন প্রিণ্টারও বলা হয়। কারণ যত রকমের অক্ষর এবং ইংরাজী সংকেত আছে, এই প্রিণ্টার সেগুলো ছাপতে পারে। সাধারণতঃ একটি চেনের উপর এই অক্ষরগুলো থাকে এবং এই চেনটি দ্রুত ঘুরতে পারে। অনেক সময় ব্যারেলের মধ্যেও এই অক্ষরগুলো সাজান থাকে। আরও এক ধরনের প্রিণ্টারের খবর জানা যায় যেটিকে বলা হয় 'ডট ম্যাট্রিকস্' (Dot Matrix) প্রিণ্টার। এই ব্যারেলের উপর কার্বন ফিতে (Carban tape) লাগান থাকে যার ফলে অতি সহজেই এক মিনিটে 1200 লাইন এরা ছাপতে পারে এবং প্রতিটি লাইনে 120টি অক্ষর থাকে, এবং যে কাগজটিতে অক্ষর ছাপা হয় সেখানে 120টি করে অক্ষর ছাপবার ব্যবস্থা থাকে। এটাই সাধারণত স্টাণ্ডার্ড (standard) ধরে নেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

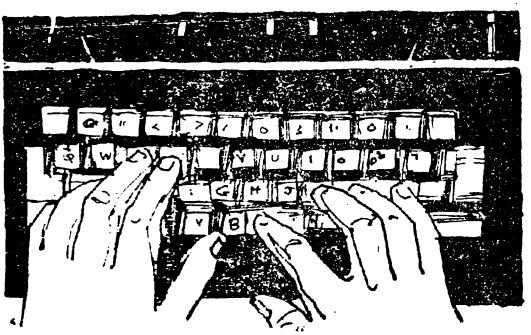

চৌম্বকীয় ফিতা (Magnetic tape)

সাধারণত এই ধরনের টেপ বা ফিতা ½" চওড়া হয় এবং 1200, 2400, 3600 ft এর মত লম্বা হয়। যখন ব্যবহার করা হয় না তখন এই টেপ রিলগুলোকে ক্যাবিনেট বা তাকে সাজিয়ে রাখা হয়। এই টেপগুলো এক ধরনের টেপ গ্রহণ যন্ত্রের (Magnetic tape drive) মধ্যে বসান হয় এবং সেখানে স্যুইচ টিপে সরাসরি তথ্য কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।

এই টেপে যখন তথ্য মজুত করে রাখা হয়, তখন এরা নির্গম বা out put হিসেবে কাজ করে আবার সেই মজুত তথ্য নিয়ে যখন কম্পিউটারে কাজ করা হয় তখন এগুলো অনুপ্রবেশ (input) হিসেবে কাজ করে। আধুনিক যে সমস্ত টেপ ব্যবহার করা হচ্ছে, এগুলো 1 ইঞ্চিতে প্রায় 1600 ক্যারেকটার ধরে রাখতে পারে।

চৌম্বকীয় চাকতি (Magnetic Disk)

চৌম্বকীয় চাকতি বা ম্যাগনেটিক ডিস্ক বিভিন্ন আকারের হয়। এই ডিস্কগুলোতে সাজান থাকে গোলাকার ভিন্ন ভিন্ন চাকতি এ গুলোকে ট্র্যাক (track) বলা হয়। একটি ডিস্কে প্রায় 200টি ট্র্যাক থাকে। উপর ও নীচে মিলিয়ে মোট 12টি তল থাকে। এদের মধ্যে মোট 10টি তলে তথ্যকে ধরে রাখা যায়। এই ডিস্কের মধ্যে থেকে তথ্য আদান প্রদান করা যায়। যখন এই ডিস্কে তথ্য লেখা হয়, তখন এটি নির্গম (out put) হিসেবে কাজ করে। আবার যখন এই ডিস্ক থেকে তথ্য নিয়ে কম্পিউটারে কাজ করা হয়, তখন এরা অনু-প্রবেশ (Input) আকারে কাজ করে।

---

104 ডায়মণ্ড হারবার রোড, কল-4

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

জীবনের জয়যাত্রার মানুষ

সুধাংশু পাত্র। ১৫ টাকা

সেকালে এদেশে বিজ্ঞান চর্চা

অরূপরতন ভট্টাচার্য। ৮ টাকা

দে'জ পাবলিশিং

13 বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সৃষ্টির পর সেই অন্ধকার যুগ থেকে দীর্ঘ ক্রম-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা আজকের এই মানুষ। লক্ষ কোটি বছরের এ ইতিহাসকে প্রায় গল্পের ছলে শুনিয়ে গেছেন সুধাংশু পাত্র। পড়তে পড়তে কোথাও আটকে যেতে হয় না। অথচ রোমাঞ্চ জাগে সভ্যতার ইতিহাস জানতে জানতে।

মানুষের উৎপত্তি এবং এই যে সামনে চলে আসা, একে লেখক দেখেছেন তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বিবর্তনবাদের নানা তত্ত্ব ও প্রসঙ্গ। পৃথিবী ও প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে যে সব ভাববাদী কাহিনী আছে, তাদেরও অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন লেখক। প্রাণের প্রথম স্পন্দন মহাশূন্যের অন্য কোনো জায়গা থেকে আসেনি, এ তথ্য তিনি দিয়েছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে।

ডারউইন সাহেবের যে তত্ত্ব চমকে দিয়েছিল সমস্ত পৃথিবী আর তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে, সেই তত্ত্বকেই লেখক সমর্থন করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এ বইয়ের সব জায়গাতেই। আমাদের মনের গভীরে যে কুসংস্কারের কুয়াশা তাকে সরিয়ে ফেলতে সমর্থ হবে এই বইটি, এমন আশা করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, যে সব সবুজ মন আগামী দিনে বেড়ে উঠবে তাদেরও ধারণা তৈরি করার কাজে খুবই লেগে যাবে সুধাংশুবাবুর লেখা।

তবে পড়তে পড়তে একটা অভাব বোধ করি, কিছু ছবি আর গ্রাফ থাকলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখে যাওয়ার অন্য-রকম মজা পেতেন পড়ুয়ারা। প্রাণ বিবর্তনের জটিল ইতিহাস যেমন সরল-ভাবে লিখেছেন সুধাংশুবাবু, ছবি তাকে আরও সজীব করতে পারত।

বিজ্ঞান কথাটির সাদা মানে জ্ঞান। মানুষের সভ্যতার রথ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরম মিত্র হিসেবে পেয়েছে বিজ্ঞানকে। দূরকে নিকট করা, আর নানান সমস্যার সমাধানে এই বিশেষ জ্ঞান তার সদা জাগ্রত বন্ধু।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উন্নতির আর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আমরা পেয়েছিলাম অনেক বিজ্ঞানী। যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, বীজগণিত, আয়ুর্বেদ, রসায়ন।

বিবরণ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লেখক কিছু কিছু দুঃসাহসিক কাজ করেছেন এ বইয়ে। তিনি দাবী করেছেন প্লাস্টিক সার্জারির আবিষ্কার ভারতবর্ষে। তার এই তত্ত্বের সমর্থনে তিনি অবশ্য তত্ত্বও হাজির করেছেন, যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে।

বিস্মিত হয়ে যেতে হয় প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিৎসার নানান যন্ত্র-পাতির ছবি দেখে। প্রত্যেকটির নাম আর চেহারা কি অসামান্য যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন লেখক অরূপরতন ভট্টাচার্য। তাছাড়া প্রতিটি 'অস্ত্রে'রই আছে বিস্তারিত বিবরণ।

এই বই পড়ে আমরা আবিষ্কার করি সেই ভারতবর্ষকে, যেখানে তৈরি মরচেবিহীন লৌহস্তম্ভ, পুরু আলেক-জাণ্ডারকে উপহার দিতেন 30 পাউণ্ড ইস্পাত, জীবক মাথার করোটি কেটে ক্ষতস্থান থেকে বার করতেন ক্রিমি, আর শূন্য তো আমাদেরই আবিষ্কার।

গৌরবজনক সেইসব অধ্যায়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বারবার রোমাঞ্চিত হব আমরা। হতে চাইব।

কিন্নর রায়

1এ মুখার্জী পাড়া লেন, কল-26।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের খবর

ঘনাদা ক্লাব

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের 'ঘনাদা ক্লাব' এর প্রতীক চিহ্ন চতুর দাঁড় কাকের ছবিটি নিচে প্রকাশিত হল। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি সংখ্যা বিশেষ 'ঘনাদা সংখ্যা' রূপে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল।

ঘনাদা ক্লাব এর প্রতীক চিহ্ন

এবং বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য রচনার সম্ভাব্য সূচীপত্রও এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রচনা দপ্তরে জমা পড়ছে। এবং নির্বাচিত বিষয়ের জন্য ঘনাদা বিশেষজ্ঞ ও ঘনাদা প্রেমিকদের লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ঘনাদা বিষয়ক রচনা দপ্তরে পাঠাবার শেষ তারিখ 30 মার্চ '86।

সায়েন্স ক্লাব

ইতিমধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাব বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীর জন্য কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের সায়েন্স ক্লাব শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। প্রাথমিকভাবে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ সেইসব সংস্থাদের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। জন মানসে বিজ্ঞান সচেতনতা ও প্রসারের জন্য আরও বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী হওয়া উচিৎ।

বিজ্ঞান সংবাদ

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েশন পঃবঃ শাখার বার্ষিক অধিবেশন

আগামী 30 মার্চ কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার হলে সকাল 10 টায় অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েসন এর পঃ বঃ শাখার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও ছাত্রগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বক্তৃতা ক্যুইজ কনটেস্ট ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার অর্পন করা হবে। বিজ্ঞান অনুরাগী সকলকেই যোগদানের জন্য সংস্থার সম্পাদিকা আমন্ত্রন জানিয়েছেন।

'মানব মন' পত্রিকার রজত জয়ন্তী উৎসব

গত 16 ফেব্রুয়ারী '86 মৌলালির যুবকেন্দ্রে মানব মন পত্রিকার রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 16 ও 17 ফেব্রুয়ারি যুবকেন্দ্রে মানসিক ব্যাধি ও আমাদের কর্তব্য গ্রহ "লৌকিক নয় অলৌকিক" শীর্ষক প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

কুসংস্কার ও দূষণের বিরুদ্ধে

মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ, ইয়ুথ কর্ণার প্রভৃতি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গর্ত 12—15 নভেম্বর '85 ইয়ুথ কর্ণার পূজা প্রাঙ্গণে একটি কুসংস্কার ও দূষণ বিরোধী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। চার দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল।

বিজ্ঞান শিবির সংবাদ

গত 1লা ফেব্রুয়ারী, 1986 কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে দশম নিখিল বঙ্গ শিল্প-বিজ্ঞান শিবিরের উদ্বোধন হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ বি. ডি. নাগচৌধুরী বিকল্প শক্তির সঠিক রূপায়ণের কথা মূল্যায়ন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে ডাঃ এস. সি. পাকড়াশী শিবিরে চারদিনের কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী মহাশয়। এই শিবিরে কমপিউটার ও সৌর শক্তির দুইটি তিনদিনের সমান্তরাল পাঠক্রম দেওয়া শুরু হয়। এই পাঠক্রমে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে থেকে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীঅরূপ রতন ভট্টাচার্য ও জগদজীবন ঘোষ মহাশয়কে বিজ্ঞান পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে জুলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট ন্যাসনাল এটলাস, মুর্শিদাবাদ জিলা বিজ্ঞান পরিষদ, রোহিনী এস্ট্রোফিজিক্স, প্রভৃতি সংস্থা চিত্তাকর্ষক মডেল প্রদর্শিত করছে।

এই শিবিরটি কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করে দ্যা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন অফ্ বেঙ্গল।

লতানে উদ্ভিদ নুললতা

এণাক্ষী বিশ্বাস

নুললতা সাধারণতঃ বহুবর্ষজীবি কাষ্ঠল লতানে উদ্ভিদ। প্রায় 20 ফুট উচ্চতা সহজেই পৌঁছুতে পারে। আকাশী নীল রঙের বড় বড় ফুল হয় সেজন্য ইংরাজীতে স্কাই ফ্লাওয়ার বলা হয়। হিন্দীতে মুলুতা, অসমীয়াতে কুকুয়ালেতি, পাঞ্জাবীতে কাণেসী, বাংলায় নুললতা নামে পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নামকরণ থামবারজিয়া গ্রান ডি ফ্লো রা অ্যা কান থোসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রক্সবার্গ এই উদ্ভিদটিকে বর্ণনা করেন। গনের নাম সুইডেনে অবস্থিত উপসালার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, অধ্যাপক কার্ল পিটার থামবারজ্-এর সম্মানে থামবারজিয়া হয়।

তবে এই উদ্ভিদটির আদি বাসস্থান বাংলাদেশ। বর্তমানে নিজস্ব সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্রতার জন্য সারা পৃথিবীতেই নিজের স্থান নিয়েছে। ফুলগুলি খুব বড় বড় হয়। সাধারণতঃ মার্চ থেকে নভেম্বর মাস ফুলের মরশুম। বাগানের খুব উঁচু দেওয়াল সাজানোর পক্ষে উপযুক্ত ফুল গাছ। শীতকালে গাছে ফল আসে।

ফুলগুলি উজ্জ্বল বর্ণের বড় বড় পাঁচটি পাঁপড়িযুক্ত হয়। বৃতি ছোট ছোট হয়ে কেবলমাত্র বেড়ের মত হয়। ফুলগুলির দলমন্ডলের নল খুব ছোট হয়। অতঃপর বিস্তৃত হয়ে পাঁচটি পাঁপড়িতে বিভক্ত হয়। দুটি পাঁপড়ি, উপর অর্ধেক সাদা হয়। গলার কাছে হলুদের মধ্যে হাল্কা বেগুনী দাগ থাকে। দলমন্ডলের উপরিতলে একটি থাঁজ থাকে—যার মধ্যে পুংদন্ড ও গর্ভদন্ড থাকে। এই ফুলটির পরাগসংযোগ পতঙ্গ দ্বারা সংঘটিত হয় এবং ফুলের গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য পরাগসংযোগ পদ্ধতিটি চিত্তাকর্ষক।

এই ফুলটির রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ফুলের মধ্যে এপিজেনিন-7-গ্লুকোরোনাইড লুটিওলিন পাওয়া যায়। আর ফুলের মধুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সুক্রোজ, অল্প গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড, সেরাইন, গ্লাইসিন, এলানাইন, ভেলাইন পাওয়া যায়।

এই ফুল গাছটির ভেষজ গুণও বর্তমান। যেমন—মালয় দেশে পাকস্থলীর রোগে এই গাছটির পাতাগুলি থেঁতো করে ব্যবহার করা হয়। আবার পুলটিস হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।

[ফটো তুলেছেন ঃ সুবল কৃষ্ণ দে]

দরজা নেই এমন ঘর

কিন্নর রায়

কতরকমের ঘরবাড়িই না বানাতে পারে মানুষ !

পূর্ব আফ্রিকার নুবানদের বাড়িঘর দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এদের গেরোস্থালীর লাগোয়া থাকে ফসল রাখার জায়গা। সেটাও যেন এক দুর্গ। এই শস্য-গোলাগুলো তৈরি হয় বিশেষ ঋতুর কথা মনে রেখে, সে সময় হল দীর্ঘ শুকনো দিনগুলো। পাহাড়ের আশেপাশে পাথরের ওপর নুবানরা তৈরি করে ঘর, শস্য রাখার গোলা। পাথরে চারপাশ ঘেরা থাকে বলে সুবিধে অনেক। পাথরের ওপরই তৈরি হয় বাড়ি। নুবান কৃষক সমস্ত কিছু তৈরি করে নিজে গায়ে খেটে। তারপর গরুর পিঠে চড়ে ঘুরে ঘুরে দেখে চারদিক, সব ঠিক আছে কিনা।

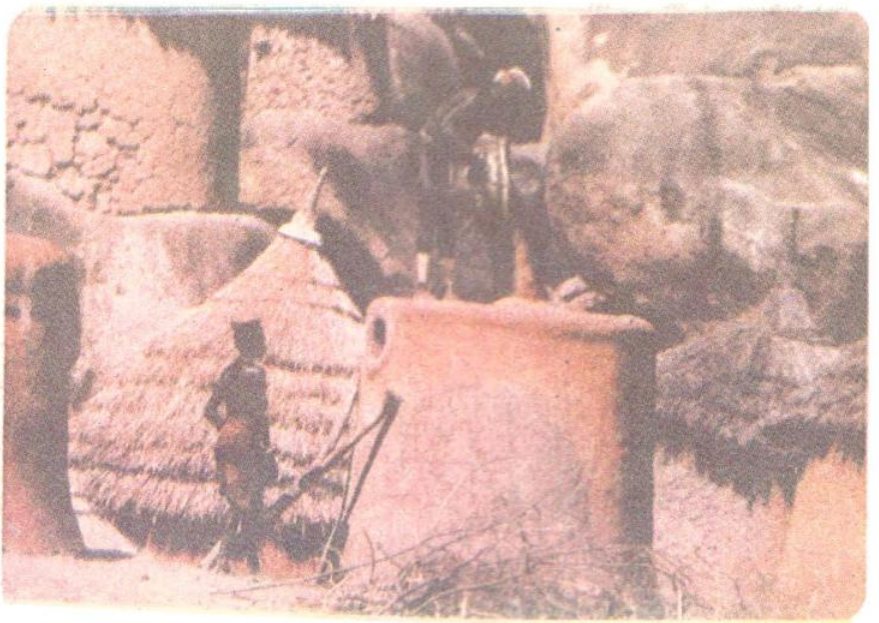

সুন্দর পরিচ্ছন্ন এইসব থাকার জায়গা তৈরি হয় আশেপাশে সহজে পাওয়া যায় এমন সব জিনিসপত্র দিয়েই। মোটাসোটা কাঠে তৈরি হয় খাঁচা, তার ওপর কাদার প্রলেপ দিয়ে দেয়াল। ভেতরটা ঠান্ডা রাখার জন্যে মাথার ওপর খড়ের ছাউনি। ফসল রাখার জায়গা আর শোয়া বসার ঘর, দুটোই হয় নিচু আর গোল মতো।

খুব খারাপ আবহওয়ায় থাকার জন্যে তৈরি হয় অন্য ধরনের ঘর। মাটি থেকে দু মিটার উঁচু এইসব ঘরে ঢোকার দরজা নেই। এদের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে আমাদের দেশের লোধাদের কক্ষ। ওদের ঘরেও আগে দরজার পাল্লা থাকত না। ভগবান ঢুকতে পারবেন না পাল্লা থাকলে, এমনই সংস্কার। একটা গোল ফুটো আছে, বড় জোর হাতখনেক চওড়া। তার ভেতর নিজের আজন্ম কুশলতায় দিব্যি ঢুকে পড়ে নুবান-মানুষ। এর শুকনো ঠান্ডা গভীরে সাপ বা অন্যান্য সরীসৃপ আসতে পারে না। প্রাচীন আরব-দাস ব্যবসায়ী, আর বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই নুবানরা এ ধরণের পাহাড় ঘেঁষা গ্রামের পত্তন করেছিল বলে মনে হয়। তাছাড়া বৃষ্টির জলও তোড়ে বেরিয়ে যায় পাহাড়ের গা বেয়ে, জমে না। সেটাও একটা মস্ত সুবিধে ওদের কাছে। উঁচু পাথুরে ভিত, খড়-কাদার ছাউনি আর পাথরের আড়াল তাদের বাঁচায় অতিরিক্ত গরম থেকে।

এখন অবশ্য ক্রমেই বদলে যাচ্ছে দিনকাল। সভ্যতার বিষ, নকল-সাহেবিপনা ক্রমশই খেয়ে ফেলছে নুবানদের সহজ-সরল জীবন। পশ্চিমী অনুকরণের ঝোঁকে ওরা পাহাড় থেকে নেমে আসছে মাটিতে। বিদেশী পণ্য আর জীবনযাত্রা ওদের ঐতিহ্যকে খুন করেছে। এমনও শোনা যায়, নুবানদের সেই বিখ্যাত ফেস পেইনটিং (মুখে রং লাগিয়ে চিত্র-বিচিত্র করা) শুধুমাত্র ট্যুরিস্টদের দেখানোর জন্যেই হবে।

একেই বলে সভ্যতা ?

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত ধূমকেতু প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার বিশেষ পুরস্কার

হ্যালির বিদায় / জাহাঙ্গীর আলম

2138 খ্রীস্টাব্দের এক সকালে বিজ্ঞানী খোরানা তাঁর পারমাণবিক চুল্লীতে গত রাতের বাসী পুঁই শাকের চচ্চড়ির বাটিটি চাপিয়ে সবে গরম করতে বসেছেন, এমন সময় দরজার পাশে দাঁড়াল রোবটটি। বলে উঠল, 'বিজ্ঞানী ভুষণ্ডী আসছেন ; স্যার।'

– সঙ্গে সঙ্গে চুল্লী থেকে শাকের বাটিটি নামিয়ে লুকিয়ে ফেললেন বিজ্ঞানী খোরানা। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাঁদরটিকে নিয়ে তো আর পারা গেল না। রোজ রোজ এভাবে শাকে ভাগ বসালে ভাল লাগে? এই আকালের দিনে শাক পাওয়া যে কি ঝামেলার ব্যাপার তা....

কথার মাঝেই আবির্ভাব ঘটল মিস্টার ভুষণ্ডীর। এসেই বললেন, 'না ভায়া, আজ আর শাক চাইব না ; শাকের বাটিটি লুকিয়ে না রাখলেও—'

বিজ্ঞানী খোরানা লজ্জিত হলেন। বাটি জানতে পারল কেমন করে? বললেন, 'আরে না না, লুকাব কেন? গরম হয়েই গিয়েছিল, তাই—

'হ্যালির ধূমকেতু তার ত্রিশতম সফরে এসেছে এবং ফিরে গিয়েছে। এবার বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন সাড়া জাগে নি এর জন্য, যেমনটি জেগেছিল ছিয়াত্তর বছর আগে দু-হাজার বাষট্টি খ্রীস্টাব্দে'—স্বয়ংক্রিয় রেডিও মারফত ধ্বনিত হল, মিস্টার খোরানার কথার মাঝেই।

ভুষণ্ডী লাফিয়ে উঠলেন ; বললেন, 'শিগ্‌গীর তৈরি হয়ে নে এইজনাই এসেছি। আমার মনে হচ্ছে হ্যালি আর একদমই ফিরবে না। আমার গবেষণা যদি সত্য হয়, তাহলে তো—নে, নে, রেডি হয়ে নে।'

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল খোরানা আর ভুষণ্ডী ল্যাবরেটরির একপাশে একটি টানেলের মত জায়গায় ঢুকে একটা বিদ্‌ঘুটে ধরনের টাইম-গাড়িতে চেপে বসলেন। সুইচ টিপতেই গাড়িটা সময় সমুদ্রে সাঁতার দিতে লাগল ; সামনের পর্দায় ফুটে উঠতে লাগল—2139,...2140.... 2141....2160....2180 ক্রমে ক্রমে 2212, 2213, তারপর 2214 ফুটে উঠতেই সুইচ টিপে সময় সমুদ্রে নোঙর করলেন।

গাড়ী থামতেই দুজনে সামনের পর্দায় দৃশ্যমান 2214 খ্রীস্টাব্দের পৃথিবীটাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। খুব একটা পছন্দ হল না ; চারিদিক নিঃস্তব্ধ। লোকজনও বিশেষ চোখে পড়ছে না। যা পড়ছে তাদের কিম্ভূত-কিমাকার পোষাক দেখে মানুষ বলে বোঝাই যায় না। প্রায় সকলের গায়েই কমপিউটারের মত কি যেন ফিট করা। যারা চলাফেরা করছে তাদের পায়ে চাকার মত কি যেন লাগান। সবাই কিন্তু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি বেল্ট পরে।

কিন্তু এসব দেখে সময় নষ্ট করলেন না তাঁরা। 2214 খ্রীস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী থেকে মহাকাশের বুকে যে যে ঘটনা ঘটেছে সেদিকে দৃষ্টি দিলেন। অত্যাশ্চর্য অনেক কিছুই ছিল। মহাকাশযান যে ফিরে এল আলফা সেণ্টাউরি থেকে, সেদিকে ওঁদের নজরই নেই ; তারা তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে খুঁজছেন হ্যালির ধূমকেতুকে। এই বছরেই তো তার ফেরার কথা। কই, তার যে কোন নাম-গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে না। পয়লা জানুয়ারী থেকে শুরু করে মার্চ-এপ্রিল, অক্টোবর-নভেম্বর, ক্রমে ডিসেম্বরও শেষ হয়ে গেল। না, হ্যালি এল না।

'ব্যাপারটা বুঝছিস তো। কোন কারণে হয়তো হ্যালির কক্ষপথ অধিবৃত্তাকার হয়ে গেছে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথ না হলে ধূমকেতুরা মহাকাশের বুকে হারিয়ে যায়।'—জানালেন বিজ্ঞানী ভুষণ্ডী।

তখন খোরানা সময় সমুদ্রে ব্যাক গিয়ার দিয়ে টাইম গাড়িটার সুইচ টিপে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'আমার এইজন্য দুঃখ হচ্ছে যে, একটি অসাধারণ সৌন্দর্যময় জিনিস হারিয়ে গেল। আর যাবে না-ই কেন? সমস্ত পৃথিবীটাই যে রহস্যময়। সুতরাং নিজেও রহস্যময় হয়ে এই রহস্যপূর্ণ পৃথিবীকে ত্যাগ করে ধূমকেতু চলে যেতেই পারে। পৃথিবীতে যে, কেউ আর থাকতে চাইছে না। অসার মাটি ; তেজস্ক্রিয়তা আর আবহাওয়া দূষণের ফলে পৃথিবী ছেড়ে নক্ষত্রপুঞ্জের আর সব বাসোপযোগী গ্রহে গিয়ে আস্তানা গাড়ছে সবাই।' 2138 খ্রীস্টাব্দ পর্দায় ফুটে উঠতে সুইচ বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামতে নামতে দুঃখ করলেন বিজ্ঞানী খোরানা, 'হ্যালিও আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল, কেউ আর থাকছে না।'

গুড়ো পাশলা এস. কে. শিক্ষানিকেতন
প্রোঃ + গ্রাঃ নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ 742184

বিজ্ঞান শিক্ষা

প্রঃ বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ থেকে পপি ভরদ্বাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়-হাওড়া থেকে তন্ময় চৌধুরী জানতে চেয়েছিলে 'চাল থেকে মুড়ি কি ধরণের পরিবর্তন?' এবং নারায়ণ চক্রবর্তী, তরুণ ব্যানার্জী, ও নিমাই দে জানতে চেয়েছিলে 'বজ্রের শব্দ শোনার আগে আমরা বিদ্যুৎ চমক দেখি কেন?'

তোমাদের সবার উত্তর গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ।

প্রঃ পৃথিবীর কোন্ জায়গায় একদিনে দুটি তারিখ দেখা যায় এবং এটি কিভাবে ঘটে? দীপালী কর্মকার—গেলিয়া, বাঁকুড়া। এবার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

উঃ পৃথিবী তার মেরু অবলম্বনে 24 ঘণ্টায় (23 ঘঃ 56 মিঃ 5 সেঃ) একবার পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে। আবর্তনের ফলে তাই তাকে তার নিজ পরিধির 360° কৌণিক দূরত্ব 24 ঘণ্টায় আবর্তন করতে হচ্ছে। অতএব আবর্তনের দ্বারা 1° অতিক্রম করতে সময় লাগে $360 \div 24$ ঘণ্টা $= 4$ মিনিট।

পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণে সুমেরু ও কুমেরু বিন্দুর সংযোগ রক্ষাকারী পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রতি 1° অন্তর দ্রাঘিমা রেখা নামে কতকগুলি রেখার কল্পনা করা হয়েছে। এর একটিকে বলে মূল মধ্যরেখা বা মূল দ্রাঘিমারেখা। এই রেখাটিকে গ্রীনিচ শহরের পাশ দিয়ে গেছে ধরা হয় এবং এখানকার মান ধরা হয় 0°। এই 0° থেকে পূর্বে ও পশ্চিমে 1° অন্তর অন্তর মোট 180টি করে রেখা কল্পনা করায় পৃথিবীর গোলত্বের জন্য 180° মানের দ্রাঘিমারেখাটি 0°-র ঠিক বিপরীতে অবস্থান করছে।

গ্রীনিচের সময়কে অর্থাৎ 0° দ্রাঘিমারেখাকে প্রমাণ সময় ধরলে প্রতি 1° অন্তর সময়ের পার্থক্য হবে 4 মিনিট। যেহেতু পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাক খাচ্ছে তাই অপেক্ষাকৃত পূর্বের দেশগুলির স্থানীয় সময় 1° অন্তর 4 মিনিট হিসেবে এগিয়ে যাবে এবং পশ্চিমদিকে 4 মিনিট করে পিছিয়ে আসবে। উদাহরণস্বরূপ গ্রীনিচে যখন মধ্যাহ্ন তখন গ্রীনিচ থেকে $88\frac{1}{2}°$ পূর্ব-দ্রাঘিমায় অবস্থিত কলিকাতার সময় হবে 12টা $+ 88\frac{1}{2} \times 4$ মিঃ $=$ 12টা $+ 354$ মিঃ $-$ 12টা $+$ 5টা 54 মিনিট। অর্থাৎ স্থানীয় সময় হবে বিকেল 5টা 54 মিনিট। তেমনই 74° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় হবে 12টার 74×4 মিনিট পূর্বে অর্থাৎ সকাল 7টা 4 মিনিট।

এখন দুজন ব্যক্তি যদি একই সময়ে ধরা যাক বেলা 10 টার সময় একই বেগে উড়োজাহাজে করে পূর্ব ও পশ্চিমদিকে এগিয়ে যায় তাহলে উভয়ে যখন 180° দ্রাঘিমারেখাতে মিলিত হবে তখন পূর্বগামী ব্যক্তি দেখবে 180×4 মিঃ বা 12 ঘণ্টা গ্রীনিচের ঘড়ি থেকে এগিয়ে আর পশ্চিমগামী ব্যক্তি দেখবে, সে পেছিয়ে আছে। গোলমাল হবে পুরো একটি দিনের। অর্থাৎ একজনের হবে সেইদিন রাত 10টা আর অপরজনের হবে পূর্ব দিনের রাত 10টা।

এইভাবে 180 দ্রাঘিমা রেখাতে একদিনে দুটি তারিখ হবে। উক্ত রেখাটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তর দিকে বেরিং প্রণালীর কাছে সাইবেরিয়া ও অ্যালুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ দিকে ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের উপর পড়েছে। পূর্বের হিসাবে ঐসব জায়গায় একদিনে দুটি তারিখ পড়ার কথা।

উপরোক্ত অসুবিধাকে দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে 180 দ্রাঘিমারেখাটিকে এবং অ্যালুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে 7° পশ্চিমে ও ফিজি ও চাথাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে 11° বাঁকা করে কল্পনা করা হয়েছে। আর সমস্ত রেখাটিকে জলরাশির উপর ফেলা হয়েছে। ওতে অসুবিধাও দূর হয়েছে। রেখাটি বেঁকে যাওয়ার জন্য সাইবেরিয়ার লোকেরা সাইবেরিয়ার স্থানীয় সময় ধরে চলে, অ্যালুইশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা উত্তর আমেরিকার সময় ধরে চলে এবং ফিজি চ্যাথাম প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসীরা নিউজিল্যাণ্ডের সময় হিসাবে চলে।

প্রঃ গ্রহদের আলো স্থির, অথচ নক্ষত্ররা ঝিকমিক করে কেন?—এইটি বিশেষ সমস্যার কথা উল্লেখ করে উত্তর লিখে জানিয়েছেন **অনুপকুমার ধাওয়ান**, বিজ্ঞান শিক্ষক, বাখরাদ ভারতী বিদ্যাপীঠ মেদিনীপুর থেকে এবং কারণ জানতে চেয়েছো **কৃষ্ণগোপাল সেন**—চাঁদমারী, আসানসোল থেকে।

উঃ অনুপবাবু, আপনার অনুমানের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, গ্রহদের নিজস্ব আলো না থাকলেও সূর্যের কাছাকাছি অবস্থান করার জন্য পর্যাপ্ত আলো লাভ করছে। নক্ষত্র অপেক্ষা ওরা পৃথিবীর অনেক অনেক কাছে। অপরদিকে নক্ষত্রের নিজস্ব আলো থাকলেও তারা আছে বহু আলোকবর্ষ দূরে। তাই পৃথিবী থেকে ওদের অনেক নিষ্প্রভ দেখায়। ঐ নিষ্প্রভ আলোকরশ্মিকে আবার পৃথিবীর উপরিভাগের বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তরকে অতিক্রম করে আসতে হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন প্রতি-

সরাঙ্কের পরিবর্তন ঘটছে অপরদিকে তেমনই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা ও জলকণার দ্বারা আলোক-রশ্মির কিছু অংশকে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হতে হচ্ছে। ফলে দর্শকের চোখে নক্ষত্র থেকে আগত কোন বিশেষ দিক থেকে আলোকের পরিমাণ সব সময় সমান থাকে না।

গ্রহরা কাছে থাকায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের পার্থক্য এবং ধূলিকণা প্রভৃতির দ্বারা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন সত্ত্বেও গ্রহ থেকে নক্ষত্রের তুলনায় অনেক বেশি আলো পৃথিবী পৃষ্ঠে দর্শকের চোখে ধরা পড়ে। এতে কোন বিশেষ দিকে উজ্জ্বলতার যে আংশিক পরিবর্তন ঘটে তা খালি চোখে ধরা যায় না। তাই গ্রহদের আলো স্থির এবং নক্ষত্রের আলোর পরিবর্তন ঘটে তথা ঝিমমিক করে মনে হয়।

প্রঃ সমুদ্রের জল লোনা কেন? 1. পূরবী দত্ত—ঠাকুরচক, মেদিনীপুর 2. সুবিল ভট্টাচার্য—রাণাপ্রতাপ রোড, দুর্গাপুর-4।

উঃ কোটি কোটি বছর ধরে জলচক্রের মাধ্যমে একই জল স্থলভাগ ও সমুদ্রের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। স্থল-ভাগের উপর দিয়ে জল নদীনালার মাধ্যমে গড়াতে গড়াতে যখন সমুদ্রের বুকে পড়ে তখন সঙ্গে করে নিয়ে যায় ভূপৃষ্ঠে জলে দ্রবীভূত হয় এমন সব লবণকে। সেই সব লবণের মধ্য আবার খাদ্য লবণের পরিমাণ অধিক এবং এগুলি আবহমানকাল ধরে জমা পড়ছে সাগরে। অথচ এরা জলের মত বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় স্থলভাগের উপর ফিরে আসতে পারে না। সাগরেই থেকে যাচ্ছে এবং সাগরজলে খাদ্য লবণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। আদিতে সাগরজল আদৌ লবণাক্ত ছিল না। বর্তমানে গড়ে 1000 কিগ্রা সাগরজলে প্রায় 35 গ্রামের মত লবণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে লবণের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে।

বিশেষজ্ঞরা প্রতি বছর সাগরজলে কি পরিমাণ খাদ্য-লবণ জমা পড়ছে তার হিসেব কিন্তু বার করেছেন আর বার করেছেন সাগরগুলিতে মোট লবণের পরিমাণ। এই থেকে সাগরের মোট বয়সটাও মোটামুটিভাবে নির্ণয় করে নিয়েছেন।

প্রঃ চোখে জল আসে কেন? মৈত্রেয়ী বাগচী—গড়বেতা, মেদিনীপুর। শীর্ষেন্দু বিশ্বাস নারায়ণগড়, মেদিনীপুর। সুভাষচন্দ্র আগরওয়াল—পলাশীপাড়া, নদীয়া। প্রিতম ব্যানার্জী—ভাণ্ডারীহাট, হুগলী।

উঃ আমাদের অক্ষিকোটরে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনের জন্য জলের প্রয়োজন হয় এবং সেই জল তৈরি হয় চোখের পাতায় ল্যাক্রিমাল নামক গ্রন্থিতে। চোখের পাতা ফেলার সময় গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয় সামান্য পরিমাণ জল। আর সেই জল চোখের কোণ বেয়ে বিশেষ এক পথে নাকের কাছে একটা থলেতে জমা হয়। কিন্তু দুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি মানসিক আবেগ, উগ্র অথবা ঝাঁঝালো গন্ধের সংস্পর্শ ইত্যাদির ফলেও গ্রন্থিটি উত্তেজিত হয় এবং অনুরূপ অবস্থায় অনেক বেশি জল উৎপন্ন হয়। পরিমাণে অধিক হওয়ার জন্য এত জল স্বাভাবিকভাবে থলেতে গিয়ে জমা হতে পারে না।

প্রঃ শীতকালে গ্লিসারিন ব্যবহার করা হয় কেন? প্রদীপ, উত্তম, কৃষ্ণ ও ডলি—চাঁদমারী, আসানসোল।

উঃ শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে। এত কম যে, আমাদের শরীরের অনাবৃত অংশ থেকেও জল বাষ্পের আকারে বাতাসে মেশবার চেষ্টা করে। বিশেষ করে ঠোঁট প্রভৃতি যেখানকার চামড়া পাতলা সেখান থেকে শরীরের জলীয় অংশ বায়ুতে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং ঐ অংশগুলি ফেটে যায়।

তাই গ্লিসারিন ব্যবহার করলে চামড়া থেকেজল বেরিয়ে আসতে পারে না এবং চামড়াও ফাটে না। আর ঐ গুণটির জন্য প্রসাধনের বহু সামগ্রীতে গ্লিসারিনকে মেশানো হয়।

প্রঃ ডিনামাইট ও নাইট্রোগ্লিসারিন কি একই জিনিস? অনন্ত পাল, আড়ংঘাটা—নদীয়া।

উঃ নাইট্রোগ্লিসারিন নাইট্রিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিনের মিশ্রণ। উক্ত মিশ্রণ একটি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ। একটু আঘাত পেলেই আগুন ধরে যায়।

বিস্ফোরকটিকে সুবিধামত ব্যবহারের জন্য এবং সহজে বহনযোগ্য করে তোলার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় সেইটেই ডিনামাইট। সাধারণত কাইজেলগার নামক এক রকমের সছিদ্র মাটি, সোরা, ইত্যাদির দ্বারা নাইট্রো-গ্লিসারিনেকে শোষণ করিয়ে ডিনামাইট প্রস্তুত করা হয়। এর আবিষ্কর্তা নোবেল।

প্রঃ লিভিং ফসিল বা জীবন্ত জীবাশ্ম কাকে বলে? ডিম পাড়ে অথচ স্তন্যপায়ী এমন একটি প্রাণীর নাম চাই। 1. প্রণব চক্রবর্তী—সায়ের বাকড়া, বাঁকুড়া। 2. ভোলানাথ পাল—179 বা রুই পাড়া লেন, কলিকাতা-10।

উঃ পৃথিবীর আবহাওয়াটা চিরকাল একইভাবে বিরাজ করছে না। আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়া যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছে কত জীব ও উদ্ভিদ। আবার পরবর্তীকালে পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে হারিয়ে গেছে চিরতরে। প্রমাণ স্বরূপ, পৃথিবীর পাললিক শিলাস্তরে পাওয়া গেছে অতীতের সেই সব জীবদেহের ছাপ, প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ও আস্তদেহ ইত্যাদি অনেক কিছু। এইগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় জীবাশ্ম।

সুধাংশু পাত্র

পোঃ কালিন্দী, মেদিনীপুর।

বিচিত্র সংবাদ

বিচিত্র কাঠঠোকরা

পাখিদের মধ্যে একমাত্র কাঠঠোকরাই একমাত্র পাখী যারা নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার পর অবশিষ্ট খাদ্যকে সবচেয়ে সহজ ও বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে সঞ্চিত করে রাখে। অন্যান্য পাখীরা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখলেও কাঠঠোকরাদের মত এত সুন্দর উপায়ে রাখতে পারে না। সাধারণত ওক গাছে এক রকম কাঠ-ঠোকরা পাওয়া যায় যারা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য প্রথমে ওক গাছের গায়ে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ছোট ছোট গর্ত তৈরী করে এবং এর মধ্যে এরা খাদ্যবস্তু হিসেবে বাদাম বা অন্যান্য জিনিসকে ঠোঁট দিয়ে চেপে আটকে রাখে।

কোয়ালা

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে এক ধরণের অদ্ভুত স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। এরা সাধারণতঃ ইউক্যালিপটাস্ (eucalyptus) গাছে থাকে এবং খাদ্য হিসেবে কেবলমাত্র এর পাতাকেই এরা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় সর্দি (cough) নিবারক যে ভেষজ গন্ধটি পাওয়া যায় সেটি এই প্রাণীটির দেহে বা এর শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে পাওয়া যায়। চারপাশে এই উগ্র গন্ধের বাতাবরণ সৃষ্টি করে এই নিরীহ প্রাণীটি সকল শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। প্রাণীটি সব সময় অলস ভঙ্গিতে ঝিমানো অবস্থায় থাকে। এর কারণ সর্বক্ষণ ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা খাওয়ার কাল এই পাতায় মাংসপেশীকে প্রসারণ করতে সাহায্যকারী যে উদ্দীপক পদার্থটি পাওয়া যায় তা এদের দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজ কর্মকে করতে বাধা দেয়। এই উদ্দীপক পদার্থটির প্রভাবে এরা তাই সব সময় ঝিমানো অবস্থায় থাকে। অদ্ভুত এই প্রাণীটির নাম হল কোয়ালা।

কমলালেবু

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ওজনের একটি কমলা লেবু উৎপন্ন হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে। এর ওজন ছিল প্রায় 2·5 কেজি। 1981 সালের 19শে জুন তারিখে নেলস্‌প্রুট (Nelspruit) এ এক প্রদর্শনীতে এটি কে জনসাধারণের সামনের প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল। যদিও এই বৃহৎ ওজনের কমলাটি সেখান থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল।

অসীম হালদার

পূর্বকোদালিয়া, পোঃ নিউব্যারাকপুর, 24 পরগনা।

জানুয়ারী '86 সংখ্যার শব্দকুটের সমাধান

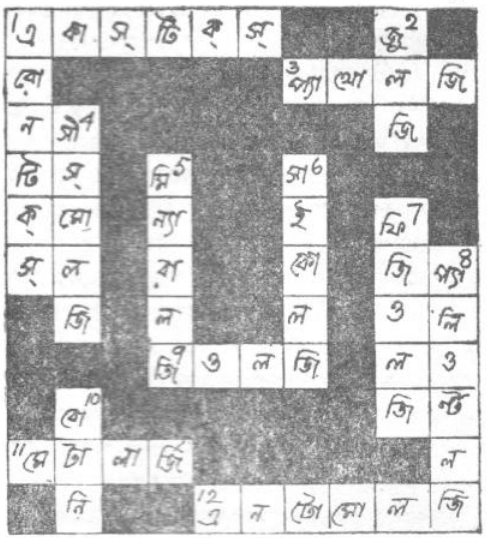

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

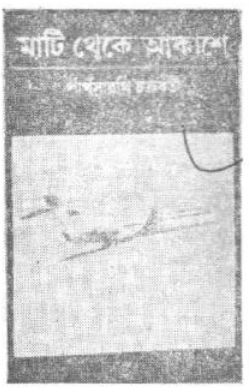

জানুয়ারী সংখ্যার 'কুইজ কনটেস্ট'-এর ফলাফল প্রকাশিত হল। মার্চ সংখ্যার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ 31শে মার্চ। সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে দশজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এ মাসের উপহার :

পার্থসারথি চক্রবর্তীর : মাটি থেকে আকাশে

পরিচালক : ছোটদের দপ্তর

বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

লীলা মজুমদার ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ লুপ্তধন ৮
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ মেঘনাদ ১০
অদ্রীশ বর্ধন ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য ৮

কারিগরী বিদ্যার প্রথম পাঠ
সহজ সরল ব্যাখ্যাসহ প্রায় অর্দ্ধশত মডেলের সচিত্র নির্মাণ প্রণালী
জয়ন্ত দত্ত সঙ্কলিত
নিজে নিজে কর ১০

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
মাটি থেকে আকাশে ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানেরআকস্মিকআবিষ্কার ৮
অমরনাথ রায়
জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা ১০
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **আলো আরও আলো** ১৫
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **রোমাঞ্চকর রসায়ণ** ১২
সাধন দাসগুপ্ত ॥ **ভাষা গণিত** ২০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক ১৫
স্যাম লয়েড ও লুইস ক্যারোলের ধাঁধা ১০

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি** ১০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু** ১০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ** ৮
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা** ১০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে। ঘনাদা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী
মেঘনাদ ॥ বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামনি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীম

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN6 th Yr Vol – 0. MERCH 1986/Regd.No.WBEC/25

ক্লাস অ্যানুয়ালে বেশী নম্বরের জন্য

অমরনাথ রায় ॥	সায়েন্স ক্যুইজ	১০
অলক চক্রবর্তী ॥	ফিজিক্স ক্যুইজ	১০
অমরনাথ রায় ॥	নলেজ ক্যুইজ	১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥	গণিত ক্যুইজ	১০
অমরনাথ রায় ॥	কেমিস্ট্রী ক্যুইজ	১০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ। ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৬, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ ও রঙিন পাতা মুদ্রণে ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ কলিকাতা ১২

মূল্য— তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র